সাংখ্য-পাতঞ্জল দর্শন

কনকপ্রভা বন্দ্যোপাধ্যায়

বিভাগীয় প্রধান, দর্শন বিভাগ

লেডী ব্রাবোর্ণ কলেজ, কলিকাতা

সাহিত্য সংস্থা ১৪/এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

SANKHA-PATANJAL DARSAN
Kanakprava Bandyopadhyay

প্রকাশক
রণধীর পাল
১৪/এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর—১৯৬১

প্রচ্ছদ শিল্পী
গণেশ বসু

মুদ্রক
রবীন্দ্র প্রেস
১২, যতীন্দ্র মোহন অ্যাভিনিউ
কলিকাতা-৬

ভূমিকা

এই বইখানি মুখ্যত দর্শনের স্নাতক (সাম্মানিক) শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য রচিত হয়েছে। বাংলাভাষায় কালীবর বেদান্তবাগীশের 'সাংখ্যদর্শন' ও রায়বাহাদুর যজ্ঞেশ্বর ঘোষের 'কাপিলাশ্রমীয় যোগদর্শন' অতি উত্তম ও প্রামাণিক রচনা। কিন্তু গ্রন্থগুলির কলেবর দেখেই বোধ হয় ছাত্রেরা ভীত হয়ে পড়ে এবং পড়বার উৎসাহ বোধ করে না। আমার শিক্ষকজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে একথাও বুঝতে পেরেছি যে যেহেতু আমাদের ছাত্ররা অধিকাংশ সময়ই প্রতীচ্য দর্শনই পড়ে সেজন্য তাদের মানসিক সংস্কার সেই ধারাতেই গড়ে ওঠে। Soul, mind, আত্মা পুরুষ এগুলি যে পর্যায় শব্দ নয়; ইংরাজি knowledge এবং সংস্কৃত জ্ঞানের অর্থ যে এক নয় ইত্যাদি হৃদয়ঙ্গম করা আয়াসসাধ্য বলেই তারা সে চেষ্টাই করে না। দুঃখের সঙ্গে এও বলতে হচ্ছে যে অতি আধুনিককালে বহু ছাত্র ইংরাজি ও সংস্কৃত দুইয়ের কোনটিই ঠিক করে শিখছে না। তাদের মাতৃভাষার বনিয়াদও অত্যন্ত কাঁচা। এর ফলে ভারতীয় দর্শনচিন্তায় যে বাক্‌শুদ্ধি, চিন্তার সূক্ষ্মতা এবং অসাধারণ ক্ষুরধার যুক্তিপ্রয়োগ দেখা যায়, ছাত্ররা সেগুলি কিছুই শিখছে না। ভারতীয় দর্শন বলতে তারা অনেকেই বোঝে অলৌকিক বিষয় নিয়ে অযৌক্তিক আধ্যাত্মিকতা। স্বভাবতই শ্রদ্ধাবান্ নয় বলে ছাত্ররা ভারতীয় দর্শন থেকে কিছুই শেখে না। ইংরাজির তুলনায় বাংলা ভাষা চারিত্রিক দিক থেকে সংস্কৃতের নিকটতর। সুতরাং ভারতীয় দর্শন সম্ভব হলে সংস্কৃতে, না হলে কোনও দেশজ ভাষায় পড়াই বাঞ্ছনীয়। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ বা হিরিয়ণ্ণা ইংরাজিতে যে মানের পুস্তক রচনা করেছেন বাংলায় তেমন একটিও নেই। বইটি লেখার সময় মানদণ্ড হিসাবে তাঁদের রচনাকেই আমি রেখেছিলাম। যদি অল্প পরিমাণেও সফল হয়ে থাকি বলে শিক্ষক ও ছাত্রদের মনে বোধ হয় তবেই আমি ধন্য হব।

এই বই রচনায় দর্শনের কয়েকজন অভিজ্ঞ অধ্যাপক আমাকে উৎসাহ না দিলে আমি কখনওই লেখার সাহস পেতাম না। তাঁদের নাম উল্লেখ না করেই আমি তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। আমি জানি যে তাঁরা

নিজগুণে আমার ত্রুটিবিচ্যুতি ক্ষমা করে নেবেন। আমার ভারতীয় দর্শনের শিক্ষাগুরু পণ্ডিত শ্রীবিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য, শ্রীদীনেশ শাস্ত্রী ও শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্যকে সকৃতজ্ঞ প্রণাম জানিয়ে শেষ করছি। রচনার যা কিছু গুণ সবই তাঁদের প্রসাদে, দোষগুলি কিন্তু আমার।

কলিকাতা

২৬শে জানুয়ারী, ১৯৮৪

কনকপ্রভা বন্দ্যোপাধ্যায়

সাংখ্য

প্রস্তাবনা—সাংখ্যমতের প্রাচীনত্ব ও আস্তিক্যাভিমান—প্রাচীন আচার্যগণ ও গ্রন্থাবলী।

সাংখ্যের প্রবক্তা কপিলমুনি আদিবিদ্বান্ নামে খ্যাত। সাংখ্যমতই সম্ভবত ভারতের প্রাচীনতম দার্শনিক সিদ্ধান্ত। স্মরণ রাখতে হবে যে, কোনও দর্শনের সিদ্ধান্তগুলি সূত্রাকারে গ্রথিত হবার বহু পূর্ব হতেই সাধারণ্যে প্রচলিত থাকে। লোকব্যবহারে সাহিত্যে পুরাণে সর্বত্রই তার প্রভাবের নিদর্শন পাওয়া যায়। এ যেন কায়ার প্রবেশের পূর্বেই তার আভাসরূপে ছায়ার প্রবেশ। পরে যখন আচার্য মনীষীরা সেই সিদ্ধান্তগুলিকেই একটি সুসংবদ্ধরূপ দান করেন, তখন ঐ পূর্বপ্রচলিত অথচ লোকব্যবহারে বিশৃঙ্খল মতটিই বহুল পরিমাণে বর্জন ও গ্রহণের ফলে পরিমার্জিত ও সুবিন্যস্ত হয়ে উপস্থাপিত হয়। সাংখ্যের ক্ষেত্রে তার প্রাচীনরূপের এরূপ পরিমার্জন অবশ্যই অনুমেয় কেন না এর সূত্রগ্রন্থটি অত্যন্তই অর্বাচীন—খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত। সূত্র অর্বাচীন হলেও সাংখ্যমত অতিপ্রাচীন এরূপ মনে করার পক্ষে প্রচুর সাক্ষ্য পাওয়া যায় উপনিষদ্, গীতা, মনুস্মৃতি, মহাভারত ও পুরাণাদিতে সাংখ্যমতের উল্লেখ ও সাংখ্যের পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার থেকে। কালীবর বেদান্তবাগীশের মতে সাংখ্যসিদ্ধান্তের সারল্য ও তত্ত্বের বাহুল্যও তার প্রাচীনত্বের নির্দেশক। সিদ্ধান্ত যত অর্বাচীন হবে ততই জটিল থেকে জটিলতর হবে এবং তত্ত্বের সংখ্যাও কমে যাবে এই নিয়ম। উপনিষদের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবাদ ও আত্মা ও ব্রহ্মের ঐক্যবাদ অবশ্যই সাংখ্যের প্রতিপাদ্য নয়। তা সত্ত্বেও কোনও কোনও পণ্ডিত—যেমন রাণাডে, বেলভলকার, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রমুখ মনে করেন যে সাংখ্যের দ্বৈতবাদও উপনিষদে পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে তাঁরা বিশেষ করে শ্বেতাশ্বতর, প্রশ্ন ও মৈত্রায়ণী উপনিষদের নাম করেন। কিন্তু ঋষি সাংখ্যের পরিভাষা ব্যবহার করেছেন বলেই যে সাংখ্যমত গ্রহণ করেছেন এমন কথা বলা অনুচিত। মনে রাখতে হবে যে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বিশেষ করেই ঈশ্বরবাদ স্থাপিত হয়েছে ; সাংখ্য কিন্তু নিরীশ্বরবাদী দর্শন বলেই খ্যাত। ঋষি সাংখ্যমতের উল্লেখ করেছেন সেটিকে খণ্ডন করবেন বলে। যথা প্রথম অধ্যায়ের দশম শ্লোকটি হ'ল—

ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ।
তস্যাভিধানাদ্যোজনাত্তত্ত্বভাবাত্ ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ ॥

এখানে স্পষ্টতই বলা হ'ল যে অনিত্যা প্রকৃতি ও বহু আত্মার উপরে নিত্য হরই অধীশ্বর। তাঁর ধ্যান করে তাঁর সঙ্গে একাত্ম হলেই বিশ্বমায়ার নিবৃত্তি হবে। এ তো সাংখ্যের বক্তব্য নয়। অনেকে অবশ্য চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকটি উদ্ধৃত করে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে সাংখ্যমতের নিদর্শন দেখাতে চান। যথা—

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ ॥

সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি পুরুষ এবং কৈবল্যবাদ যেন এই শ্লোকে ব্যাখ্যাত হয়েছে বলে মনে হয়। তবে শ্লোকে উল্লিখিত যে দ্বিতীয় পুরুষ ভোগের পর লোহিত শুক্লকৃষ্ণা অজাকে ত্যাগ করে যান্ অনেক পণ্ডিতই তাঁকে ঈশ্বর বলে মনে করেছেন। তাঁদের মতে এখানে নিত্যা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, জীব ও ঈশ্বর এই তিন তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে।

কঠোপনিষদে এবং প্রশ্নোপনিষদেও সাংখ্যের অনেক পারিভাষিক শব্দ এবং কিছু কিছু সাংখ্যসিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। যেমন কঠোপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের দশম ও একাদশ শ্লোক

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থাঃ, অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ ॥ ১০ ॥
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাত্ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিত্ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥ ১১ ॥

এই শ্লোক দুটিতে তর তম করে পর পর যাদের সাজানো হয়েছে তারা হচ্ছে ইন্দ্রিয়—অর্থ—মন—বুদ্ধি—মহান্ আত্মা বা হিরণ্যগর্ভ—অব্যক্ত—পুরুষ। এই সব শব্দগুলিই সাংখ্যেও ব্যবহৃত হয়। তবে সাংখ্যসিদ্ধান্তের সঙ্গে এই শ্লোক-দুটির বক্তব্যের একটি মৌলিক এবং একটি গৌণ ভেদ আছে। প্রথমত অব্যক্ত প্রকৃতি এবং পুরুষ সাংখ্যসিদ্ধান্তে এই দুইটি তত্ত্ব সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। সেই হিসাবে পুরুষই পরাকাষ্ঠা পরাগতি এবং প্রকৃতির থেকেও উচ্চস্তরের এমন কথা সাংখ্যে বলা হয়নি। অবশ্য পুরুষের কৈবল্যের জন্যই প্রকৃতির পরিণাম এই হিসাবে যদি পুরুষকে ঊর্ধ্বভূমিতে স্থাপন করা হয় সে আলাদা কথা। দ্বিতীয়তঃ এখানে ইন্দ্রিয়গুলির থেকেও 'অর্থ' অর্থাৎ পঞ্চমহাভূতকে সূক্ষ্মতর

বলা হয়েছে। এর একটাই ব্যাখ্যা হয় যে পঞ্চমহাভূতগুলির বিকৃতি বা পরিণামই হ'ল ইন্দ্রিয়বর্গ। এ সিদ্ধান্ত ন্যায়বৈশেষিকসম্মত কিন্তু সাংখ্যসম্মত নয়। সাংখ্যে প্রকৃতির পরিণামের যে ক্রম আছে তাতে ইন্দ্রিয়গুলি অহঙ্কারের বিকৃতি। অহঙ্কারেরই অপর বিকৃতি পঞ্চতন্মাত্র এবং তন্মাত্রগুলির বিকার হ'ল পঞ্চমহাভূত।

প্রশ্নোপনিষদে পুরুষের ষোড়শকলার কথা বলা হয়েছে। এখানে নদীগুলি যেমন সমুদ্রে বিলীন হয় তেমনই পঞ্চভূত ইন্দ্রিয় মন ইত্যাদি ষোড়শকলা কেমন করে পুরুষে বিলীন হয়ে যায় তারই বর্ণনা পাই। সাংখ্যোক্ত লিঙ্গ-শরীরের কথা এই সূত্রে মনে পড়া খুবই স্বাভাবিক।

ভগবদ্গীতা তো উপনিষদ্গুলিরই সারসংগ্রহ। কিন্তু গীতায় সমন্বয়ের প্রতি বিশেষ ঝোঁক দেওয়ায় কিছু কিছু চিন্তার অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে। এরই ফলে পরবর্তীযুগে কিছু ব্যাখ্যাকার যেমন গীতার বক্তব্যকে অদ্বৈতমতানুসারী বলেও দেখাতে পেরেছেন তেমনই অনায়াসে অন্য ব্যাখ্যাকাররা সাংখ্যোক্ত দ্বৈতবাদের সাক্ষ্যও ঐ একই গীতা থেকেই পেয়েছেন। গীতাকার অবশ্য সাংখ্য ও যোগের নাম উল্লেখ করে তারা যে বস্তুত এক একথা বলেছেন। যথা—

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ।। ৫ ।। ৪।

ত্রিগুণা পরিণামী প্রকৃতি এবং অবিনাশী নির্লেপ আত্মার কথাও গীতায় বলা হয়েছে। এছাড়া ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, প্রকৃতি, অক্ষর ইত্যাদি পারিভাষিক শব্দেরও বহুলব্যবহার গীতাকার করেছেন।

মহাভারত, মনুস্মৃতি, চরকসংহিতা পুরাণাদিতেও সাংখ্যমতের সশ্রদ্ধ উল্লেখই পাওয়া গেছে। মহাভারতে সাংখ্যকে বেদের মতই সনাতন বলা হয়েছে। শুধু বেদানুসারী গ্রন্থাদিতেই নয়, বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্রেও সাংখ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। বৌদ্ধদর্শনের দুঃখবাদ, বেদোক্ত ক্রিয়াকর্মের নিন্দা এবং সংসারের অনিত্যত্ব ও অস্থিরত্ব এ সবই সাংখ্যদর্শনেও পাই। সাংখ্য ও বৌদ্ধ দর্শনের মূল প্রতিপাদ্যে বিরোধ থাকলেও এই সাদৃশ্য কারুরই চোখ এড়িয়ে যায় না। কথিত আছে যে বুদ্ধের অন্যতম উপদেষ্টা অডার কালম সাংখ্যমতে বিশ্বাসী ছিলেন যদিও তাঁর মতের বিশদ বিবরণ জানা যায় না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তো বুদ্ধের জন্মস্থান কপিলবস্তুর নামের মধ্যে কপিল-মুনির নামও দেখতে পান।

সুতরাং স্বীকার করতেই হবে যে সাংখ্যমত অতি প্রাচীন এবং বর্তমানে যদিও এ মতের প্রভাব নগণ্য তবু এককালে যে উপনিষদের অদ্বৈতবাদের শক্তিশালী প্রতিযোগী হিসাবেই সাংখ্য গণ্য হ'ত শঙ্করাচার্যের লেখাতেই তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে। পূর্বপক্ষ খণ্ডন করতে বসে সাংখ্যকেই তিনি প্রতিপক্ষের প্রধান মল্ল বলে গণ্য করেছেন এবং যুক্তিজাল বিস্তার করে সেমত খণ্ডন করতে চেয়েছেন এই বলে যে প্রতিপক্ষের প্রধান মল্ল পরাস্ত হ'লে বাকিরা আপনিই পরাস্ত হয়েছে বলে মেনে নিতে হবে। এই একটি বিষয়ে রামানুজও শঙ্করের সঙ্গে একমত। অচেতন জড়রূপা প্রকৃতি যে সাংখ্যমতে জগৎকারণ বলে বিবেচিত হয় শঙ্করমতে তা নিতান্তই শ্রুতিবিরুদ্ধ। বাদরায়ণ থেকেই সাংখ্যের প্রতি এই বিরুদ্ধতা আরম্ভ হয়। জৈনমত খণ্ডনে চারটি, বৌদ্ধমত খণ্ডনে পনেরটি এবং সাংখ্যমত খণ্ডনে ষাটটি সূত্র রচনা করে বাদরায়ন পরিস্কার দেখিয়ে দিয়েছেন বেদান্তের সবথেকে বড় প্রতিপক্ষ কে। শঙ্কর সেই ঐতিহ্যকেই আরও পরিস্ফুট করেছেন মাত্র।

এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই একটা প্রশ্ন ওঠে। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রগুলির শ্রেণীবিন্যাস করার সময় দুটি বড় ভাগ করা হয়—আস্তিক ও নাস্তিক। আধুনিককালে আস্তিক ও নাস্তিক বলতে আমরা ঈশ্বরবাদী ও নিরীশ্বরবাদী বুঝি। কিন্তু প্রাচীন দার্শনিক আলোচনায় এই শব্দ দুইটি পারিভাষিক অর্থে প্রযুক্ত হয়। আস্তিক মতে বেদ সনাতন সত্যের অভ্রান্ত আকর—এর বিরুদ্ধে যুক্তি তর্ক অভিজ্ঞতা ইত্যাদির কোনও মূল্য নেই। নাস্তিকরা বেদের এই প্রামাণ্য অস্বীকার করেন।

সাংখ্যদর্শনকে আমরা কোন্ ভাগে ফেলব সেটা বিবেচনার বিষয়। সাংখ্যের আদিবিদ্বান্ কপিলমুনির নাম বৈদিক দেবতা বা মুনিঋষিদের তালিকায় পাওয়া যায় না। নিরীশ্বরবাদী বলে তাঁর অখ্যাতি ছিল। বৈদিক ক্রিয়াগুলির প্রতি সম্পূর্ণ বৈরাগ্য প্রকাশ করে তিনি বলেছিলেন কৈবল্যলাভের পথে এগুলির কোনও উপযোগিতা নেই। অচেতন নিত্য পরিণামী প্রকৃতিকে তিনি জগৎকারণ বলে মনে করতেন। সর্বোপরি ব্রহ্ম এবং আত্মার ঐক্য তাঁর স্বীকৃত নয়। তিনি বরং বহুপুরুষবাদী। এ সকল বিবেচনা করলে সাংখ্যের আস্তিক্যাভিমান রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। অপরপক্ষে শঙ্করাচার্যের কটূক্তি সত্ত্বেও মনে রাখতে হবে যে উপনিষদে সাংখ্যমতের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখানো হয় নি। শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রণিধানযোগ্য বিরুদ্ধ মত হিসাবেই

উপনিষদের ঋষি সাংখ্যমতের উল্লেখ করেছেন। গীতাকার তো সাংখ্যকে যেন বেদান্তেরই মত গ্রাহ্য বলে উপস্থাপিত করেছেন। পরবর্তীযুগে অবশ্য টীকাকারগণ প্রবল উৎসাহে সাংখ্যকে বেদান্তে রূপান্বিত করবার চেষ্টায় সাংখ্যের মূল তত্ত্বগুলিই বিকৃত করে দিয়েছেন এবং যে কারণেই হোক্ অদ্বৈতবেদান্তের যে প্রতিষ্ঠা এবং প্রভাব আজও দেখা যাচ্ছে সাংখ্যের তা কণামাত্রও নেই। সাংখ্যের আদিরূপ যে কী ছিল তাও খুঁজে বের করা অতি কঠিন কাজ। অধ্যাপক জিমার তো নিঃসন্দেহ যে প্রাচীন সাংখ্য প্রাক্‌বৈদিক অনার্যচিন্তার নির্যাস—এরই ব্যবহারিক প্রয়োগবিধি পাওয়া যাবে যোগশাস্ত্রে যার সঙ্গে সাংখ্যের সম্পর্ক অতি নিবিড়। জিমারের মতে প্রাচীনযুগের জাদুবিদ্যার প্রতি আস্থা এবং দ্বৈতচিন্তাই সাংখ্যসিদ্ধান্তের ভিত্তি। জিমারের বক্তব্যে হয়তো কিছু সত্যতা আছে। উপনিষদে যে সাংখ্যমত খণ্ডনের চেষ্টা রয়েছে তা তো আগেই দেখানো হয়েছে। তবুও বর্তমানে আমরা যে সাংখ্য শাস্ত্র পাই তা নিরীশ্বরবাদী হলেও বেদবিরোধী নয়। বরং শ্রুতি প্রমাণকে তিন প্রমাণের একটি বলে গ্রহণ করে এবং নিজেদের সিদ্ধান্তের সমর্থনে শ্রুতি উদ্ধৃত করে সাংখ্যাচার্যগণ নিজেদের আস্তিক শ্রেণীভুক্ত করবারই আগ্রহ দেখিয়েছেন। অতএব এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে হয় যে আদিতে যেরকমই থাকুক কালক্রমে দ্বৈতবাদ, বহুপুরুষবাদ এবং নিরীশ্বরবাদকে সমর্থন করেও সাংখ্য আস্তিকদর্শনের সমগোত্রীয় বলেই গণ্য হয়েছে।

সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি সম্বন্ধে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছনর পথে প্রধান অন্তরায় হ'ল সাংখ্যের প্রামাণ্যগ্রন্থের সংখ্যাল্পতা। পুরাণাদিতে উল্লিখিত সনক, সনন্দ, সনাতন, কপিল, আসুরি ও পঞ্চশিখ ইত্যাদি সাংখ্যাচার্যের মধ্যে একমাত্র কপিলের গ্রন্থই সমধিক প্রচলিত। অপরদের গ্রন্থাদি বিলুপ্ত হয়েছে। পঞ্চশিখ বেদান্তমতের পোষক। এ ভিন্ন বোঢ়ু ও বার্ষগণ্য নামে দুই প্রাচীন সাংখ্যাচার্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। এঁদের সম্পর্কে পণ্ডিতসমাজে কিছু মতভেদ আছে। সাংখ্যসূত্রকার কপিলের রচিত যে সূত্রগ্রন্থ বর্তমানে প্রচলিত পণ্ডিতদের মতে তা অতি অর্বাচীন—খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত। এছাড়া তত্ত্বসমাস নামে একটি স্বল্পকায় গ্রন্থ তাঁর নামে চলিত আছে। এতে মোট বাইশটি সূত্র আছে। গ্রন্থখানি থেকে সাংখ্যমত সম্পর্কে সম্যক্ ধারণা তো হয়ই না পরন্তু মনে হয় যেন কোনও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের বিষয়সূচী এটি। বর্তমানে ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা বা সাংখ্যসপ্ততিই (খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় অথবা মতান্তরে

পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত) পণ্ডিতসমাজে সাংখ্যের আকরগ্রন্থরূপে গ্রাহ্য হয়। এর উপরে গৌড়পাদ ও বাচস্পতি মিশ্র উত্তম টীকা রচনা করেছেন। তবে গৌড়পাদ যদি শঙ্করাচার্যের পরম গুরু মাণ্ডুক্যকারিকাকার হন তাহলে তিনি বেদান্তমতেরই ধারক এবং বস্তুত তাঁর ভাষ্যে তিনি বেদান্তমতকেই সাংখ্যমত বলে চালিয়েছেন। বাচস্পতির অবশ্য দর্শনশাস্ত্রে এমনই পাণ্ডিত্য ছিল যে তাঁকে বলা হত সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র। তাঁর তত্ত্বকৌমুদী নামক টীকায় তিনি কারিকার মত অক্ষুণ্ণই রেখেছেন। প্রাচীন সাংখ্যাচার্যগণ তাঁদের ব্যাখ্যায় সূত্রের উল্লেখ না করে কারিকারই উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যসূত্রের ভাষ্যের ভূমিকায় বলেছেন যে সাংখ্যশাস্ত্র কালার্কভক্ষিত হয়ে কলামাত্র অবশিষ্ট আছে—অতএব বিজ্ঞানভিক্ষু স্বয়ং অমৃতবাক্যের দ্বারা তা পূরণ করবেন। এই 'পূরণ' করতে গিয়ে বিজ্ঞানভিক্ষু নিরীশ্বর সাংখ্যকে সেশ্বরমতে পরিণত করেছিলেন এবং সাংখ্যের আসল রূপটি নষ্ট করে দিয়েছিলেন। ভাষ্যকারের নিশ্চয়ই এতখানি স্বাধীনতা থাকা উচিত নয়। এভিন্ন ষষ্টিতন্ত্র নামে একটি গ্রন্থের উল্লেখ কারিকাতে পাওয়া যায়, কিন্তু গ্রন্থটি বিলুপ্ত হয়েছে।

আমরা সাংখ্যমত আলোচনাকালে মোটামুটি ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা ও বাচস্পতিমিশ্রকৃত তত্ত্বকৌমুদী নামে কারিকার টীকার উপরই বেশী নির্ভর করবো কেননা পণ্ডিত সমাজে এইগুলির সমধিক প্রচলন এবং সাংখ্যমতের বৈশিষ্ট্য এই দুই গ্রন্থে তবু কতকটা রক্ষিত হয়েছে।

প্রয়োজন

পাশ্চাত্যদর্শনের অপেক্ষায় ভারতীয় দর্শনের একটি মৌলিক ভেদ আছে। এদেশে প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রে একথা অত্যন্ত খোলাখুলিভাবেই স্বীকার করা হয়েছে যে দার্শনিক ঋষি শুদ্ধজ্ঞানের চর্চা করবেন বলে তত্ত্বচিন্তা করতে বসেন নি। তত্ত্বজিজ্ঞাসার দ্বারা জীবনের কোনও প্রয়োজন যদি সিদ্ধ না হয় তবে কেউই কেন তত্ত্বচিন্তা করবে? কালীবর বেদান্তবাগীশ ঠিকই বলেছেন যে আমাদের দেশে দর্শন অর্থেই মোক্ষশাস্ত্র—অর্থাৎ সেই শাস্ত্র যা আমাদের মুক্তির পথ নির্দেশ করে দেয়। সাংখ্যও এর ব্যতিক্রম নয়। ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রথম কারিকাতেই বলেছেন যে ত্রিবিধ দুঃখের অভিঘাত থেকে বাঁচবার উপায় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা আমাদের মনে জাগে এবং তখন আমরা বুঝি যে যতকিছু দৃষ্ট বা আনুশ্রবিক উপায় আমাদের জানা আছে সেগুলি সবই

ব্যর্থ কেননা পুরোপুরি এবং চিরকালের মত দুঃখের হাত থেকে এসব উপায় আমাদের মুক্তি দিতে পারে না। এই ত্রিবিধ দুঃখ কী? সাংখ্যমতে এগুলি হচ্ছে (ক) আধ্যাত্মিক—অর্থাৎ নিজের দেহ মন থেকে যে দুঃখ আসে—যথা বায়ু পিত্তাদি কুপিত হ'লে বা কাম, ক্রোধ, লোভ, আসক্তি ইত্যাদির দ্বারা তাড়িত হ'লে আমরা যেসব দুঃখভোগ করি সেইগুলি। (খ) আধিভৌতিক—অর্থাৎ বহিরাগত দুঃখ—মানব, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ এবং জড়বস্তু হতে যে দুঃখ পাই সেইগুলি। এর মধ্যে আসে সর্পাঘাত, হিংস্র পশুর আক্রমণে আঘাত, শত্রুর হস্তে নিপীড়ন ইত্যাদি। (গ) আধিদৈবিক—এইগুলিও বহিরাগত—তবে এর মূলে আছে দৈব বা অনৈসর্গিক শক্তি। কুগ্রহ, যক্ষ, রক্ষ, দেব, দানব, ভূকম্পন, বন্যা ইত্যাদিতে আমাদের যে দুঃখগুলি দেয় সেইগুলি। আমরা এ সংসারে যা কিছু ভোগ করি তারই মধ্যে এই ত্রিবিধ দুঃখের কোনও না কোনওটির খাদ মেশানো আছে। এই দুঃখভোগই 'বন্ধ'। আমরা যে বদ্ধাবস্থায় আছি বা দুঃখ ভোগ করছি শাস্ত্রপাঠ করে তা জানতে হয় না। এ জ্ঞান আমাদের আছেই। আমরা আরও জানি যে বন্ধ যেমন আছে মোক্ষও আছে। শাস্ত্রপাঠ করি শুধু এই মোক্ষের উপায়টি জানবার জন্য। সাংখ্যকারও সেইটি জানাবার জন্যই আমাদের প্রতি তাঁর শাস্ত্রের উপদেশ করছেন। কিন্তু দর্শনশাস্ত্র পাঠ করে দুঃখমোচন কি হয়? রোগ-ব্যাধি, ক্ষুধাতৃষ্ণা, সর্পাঘাত, শত্রুর আক্রমণ ইত্যাদি থেকে মুক্তি পেতে কে কবে সাংখ্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে বসেছে? সাধারণ মানুষ ক্ষুধার হাত থেকে মুক্তির জন্য খাদ্যের উৎপাদন করেছে, রোগ-ব্যাধিতে চিকিৎসকের ঔষধের শরণাপন্ন হয়েছে। সাংখ্যকার সেসব ব্যাপারে কী করবেন? উত্তরে বলা হয়েছে যে দৃষ্ট উপায় যেমন খাদ্য দিয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি, ঔষধ দিয়ে রোগ নিবারণ করা যায় বটে, কিন্তু সে তো অল্পকালের জন্য। ঐ উপায়ে তো দুঃখের সমূলে আত্যন্তিক বিনাশ হয় না। আবার ক্ষুধা ব্যাধি ইত্যাদি ফিরে ফিরে আসে, আমরা বার বার দুঃখভোগ করি। তবে কি বেদবিহিত ক্রিয়া-কর্মাদি করলে দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ হবে? সাংখ্যকার এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই বেদের কর্মকাণ্ডের একান্ত ও আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির প্রতি নিষ্ফলতার কথা বলেছেন। অবশ্য উপনিষদ্, গীতা এবং বেদান্তেও এই একই কথা বলা হয়েছে। জ্ঞানেই মুক্তি। কর্মের দ্বারা স্বর্গসুখ পাওয়া যায় তবে মনে রাখতে হবে যে যজ্ঞক্রিয়া সব সময় অবিশুদ্ধি, ক্ষয় এবং অতিশয় দোষদুষ্ট। যেমন সোমযজ্ঞে প্রাণীহিংসা এবং শস্যনাশ বিহিত

আছে—এগুলির ফল পাপ এবং পাপের ফল দুঃখ। অতএব সোমযাজীকে সুখের সঙ্গে দুঃখও ভোগ করতে হবে। তাছাড়া যজ্ঞের ফলে যে পুণ্য সঞ্চিত হয় ভূরিপরিমাণ হলেও তার একটি অবধি আছে। যেমন সঞ্চিত অর্থ ভোগের দ্বারা নিঃশেষ হয় তেমনি পুণ্যরূপ সঞ্চিত কর্মফলও ভোগের দ্বারা ক্ষীণ হতে হতে নিঃশেষ হয়ে যায় এবং স্বর্গবাস অন্তে এই সংসারে পুনঃপ্রবেশ করে আমাদের পুনরায় দুঃখভোগ করতে হয়। একেই বলে ক্ষয়দোষ। এর উপরে আরও দুঃখ যে বেদবিহিত কর্ম সকলেই সমান করেন না—কেউ বেশী কেউ কম করেন। কেউ বা জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ করে শুধু স্বর্গে গমন করেন কেউ বা বাজপেয় যজ্ঞ করে স্বর্গলোকের অধীশ্বর হন। সুখভোগের এই তারতম্যকেই অতিশয় দোষ বলা হয়। একের ভাগ্যে অধিক সুখ অন্যের ভাগ্যে অল্প হ'লে ঈর্ষাবশে অল্পসুখী দুঃখভোগ করে। উল্লিখিত তিনটি দোষে দুষ্ট হওয়ায় শ্রুতি-নির্দিষ্ট উপায়েও দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না। তাই সাংখ্যকার বলেন 'দৃষ্টের' মত 'আনুশ্রবিক' উপায়ও পরমার্থআনয়নে নিষ্ফল। সত্যকার মোক্ষ আনতে পারে খালি অব্যক্ত (প্রকৃতি) ও জ্ঞ (পুরুষ) এই দুইয়ের বিবেকজ্ঞান। অর্থাৎ আমরা যদি অচেতন জড় প্রকৃতিকে 'আমি' বলে ভুল না করে নির্লিপ্ত সাক্ষীমাত্র চৈতন্যস্বরূপ পুরুষকে 'আমি' বলে বুঝি তবে পরিণামী প্রকৃতিতে জন্ম মৃত্যু আঘাত ব্যধি জরা যাই হোক্ না কেন সে দুঃখ আমাতে আরোপিত হয়ে আমাকে কষ্ট দেবে না। গীতাকার যেমন বলেছেন যার জন্মও হয় না, মৃত্যুও হয় না, যে অগ্নিতে দগ্ধ হয় না, অস্ত্রেতে আহত হয় না সেই অবিনাশী আত্মাকে জানলে আর দুঃখ থাকে না। ত্রিগুণা প্রকৃতিতে পরিণাম হচ্ছে আমাতে নয় এই বিবেকজ্ঞানের ফলেই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটে। অতএব সাংখ্যশাস্ত্রের প্রয়োজন এই বিবেকজ্ঞানের উদয়।

প্রকৃতি

আমরা দেখলাম যে সাংখ্যশাস্ত্রের প্রয়োজন নির্দেশ করতে গিয়ে শাস্ত্রকার তিনটি পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করলেন—'ব্যক্ত', 'অব্যক্ত' ও 'জ্ঞ'। এদেরই স্থানান্তরে প্রকৃতি ও পুরুষ, চিৎভাস্য ও চিৎ, দৃশ্য ও দৃক্ ইত্যাদি শব্দের দ্বারাও অভিহিত করা হয়েছে। এই শব্দগুলির প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করতে পারলে সাংখ্যসিদ্ধান্ত বুঝতে আমাদের আর অসুবিধা হবে না। এই জগৎব্রহ্মাণ্ড ব্যাখ্যা করতে বেদান্তপ্রতিপাদিত শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ এক ব্রহ্মই যথেষ্ট একথা

সাংখ্যকার মানেননি। সাংখ্যমতে মূলে আছে জড় ও চৈতন্য এই দুইটি অত্যন্ত ভিন্ন তত্ত্ব। এই তত্ত্ব দুইটি অত্যন্ত ভিন্ন হ'লেও এদের দুজনের সম্মিলিত প্রভাবেই এই সংসার অভিব্যক্ত হচ্ছে। জগৎকারণরূপে এক ব্রহ্ম স্বীকারের বিপক্ষে সাংখ্যকারের যুক্তি হ'ল যে কার্যের গুণগুলি কারণগুণজন্য। কার্যজগৎ জড়স্বভাব অথচ তার কারণ শুদ্ধচৈতন্য এ কেমন করে হবে? জগতে যা কিছু দেখা যায় ক্রমান্বয়ে তার কারণ অনুসন্ধান করতে করতে অবশেষে সাংখ্যকার এক অমূল মূলে গিয়ে পৌঁছুলেন। কারিকায় বলা হচ্ছে যে এই ব্যক্ত সংসারের ভিন্ন ভিন্ন সব কিছুই কারণ জন্য (হেতুমৎ), অনিত্য, অব্যাপি, সক্রিয়, অনেক, আশ্রিত (নিজ নিজ কারণে আশ্রিত), লিঙ্গ (অর্থাৎ প্রকৃতির চিহ্ন)। প্রকৃতি বা প্রধান প্রকৃতির চিহ্ন নয়—যদিও প্রকৃতি হ'তে পুরুষকে অনুমান করা হয় বলে প্রকৃতি পুরুষের লিঙ্গ হতে পারে), সাবয়ব পরতন্ত্র। কিন্তু আমরা চিন্তা করতে বসলে পরতন্ত্র সাবয়ব লিঙ্গে তো থেমে থাকি না। স্বাভাবিক ভাবেই স্বতন্ত্র অলিঙ্গ নিরবয়বে উত্তরণ ঘটে। এইজন্যই ব্যক্তের বিপরীত যে অব্যক্ত তাকে অকারণ, নিত্য, বিভু, এক, অনাশ্রিত, অলিঙ্গ, স্বতন্ত্র এইভাবেই ভাবতে হবে। জগতে যত ভেদ দেখছি কোনওটিই স্বতন্ত্র নয়—সকলেই পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল; এবং ক্রমান্বয়ে একে অন্যতে প্রলীন হতে হতে শেষে এক অবিবেকী প্রকৃতিতে আমরা উপনীত হই। এই অব্যক্ত হ'ল প্রকৃতি বা প্রধান এবং এর কার্যগুলি হ'ল ব্যক্ত। প্রকৃতি অচেতন, বিষয়রূপা, প্রসবধর্মী অর্থাৎ পরিণামী এবং ত্রিগুণাত্মিকা। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—যার প্রকাশ প্রীতি, অপ্রীতি ও বিষাদরূপে আমরা ব্যক্তজগতে দেখি—সেই তিনগুণই প্রকৃতিতে আছে। এই জড় অথচ কর্ত্রী প্রকৃতি চিৎস্বরূপ পুরুষের সম্পূর্ণ বিপরীত। পুরুষসান্নিধ্যহেতু প্রকৃতি প্রথমে মহৎ বা বুদ্ধি, অতঃপর অহঙ্কার, ক্রমে একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চমহাভূতে অভিব্যক্ত হয়ে জগৎসংসারে পরিণত হয়।

প্রকৃতিতত্ত্ব স্বীকার করার পক্ষে কারিকায় উল্লিখিত যুক্তিগুলি সংখ্যায় পাঁচটি। যথা—

> ভেদানাং পরিমাণাৎ, সমন্বয়াৎ, শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ।
> কারণকার্যবিভাগাদবিভাগাদ্বৈশ্বরূপ্যস্ত ॥ ১৫ ॥

ব্যক্ত জগতের কারণ হিসাবে অব্যক্ত সূক্ষ্ম প্রকৃতিকে স্বীকার করার কোনও যৌক্তিকতা ন্যায়বৈশেষিকাচার্যগণ স্বীকার করেন নি। তাঁদের মতে ব্যক্তজগৎ

ব্যক্ত পরমাণু হতে উৎপন্ন। মূল পরমাণুগুলির থেকে দ্ব্যণুকাদিক্রমে যে পঞ্চভূত এবং ভৌতিকবস্তুনিচয় সৃষ্ট হয়েছে তাদের গুণবৈচিত্র্য ঐ মূল পরমাণুগুলির বৈচিত্র্যেরই ফল। অতএব পরমাণুঅতিরিক্ত আর কোনও অব্যক্ত মূলের প্রয়োজন নাই। এই পূর্বপক্ষের উত্তরেই উপরে উদ্ধৃত যুক্তিগুলি সংগৃহীত হয়েছে। ঐগুলিকে সম্যক্ অনুধাবন করতে হলে একটি কথা সর্বদাই স্মরণে রাখতে হবে যে সাংখ্যাচার্যগণ সৎকার্যবাদী। তাঁদের মতে কার্যটি উদ্ভবের পূর্বে কারণে অব্যক্ত অবস্থায় থাকে, পরে ব্যক্ত হয় মাত্র, নূতন আরম্ভ হয় না। যেমন কূর্মের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি যখন দেহ হতে বাহিরে নির্গত হয় তখন আমরা বলি এইটি কূর্মের দেহ এবং এইগুলি তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। আবার যখন কূর্ম ঐ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভিতরে টেনে নেয় তখন তার দেহ ও প্রত্যঙ্গের ভেদ বিলুপ্ত হয় তেমনই প্রকৃতির বিকৃতিগুলি—যেমন মহৎ অহঙ্কার ইন্দ্রিয়বর্গ পঞ্চতন্মাত্র ও মহাভূতগণ কার্যরূপে ক্রমশঃ প্রকাশ পায় ও তখন কার্যকারণের মধ্যে বিভাগ দেখা দেয়। পুনর্বার প্রলয়কালে বিপরীতক্রমে ভূতগুলি তন্মাত্রে, সেইগুলি অহঙ্কারাদিতে এইভাবে অন্তে যখন মহৎ প্রকৃতিতে বিলীন হয় তখন বৈচিত্র্য বিলুপ্ত হয়ে সাংখ্যকার যাকে বৈশ্বরূপ্য বলেছেন, অর্থাৎ কার্যাবলীর কারণে বিলুপ্তি ঘটে ; অবিভক্ত একীকরণ হয়। যেমন, ভিন্ন ভিন্ন সোনার অলঙ্কার যদি গলিয়ে ফেলি তবে তারা নিজেদের বিশেষ রূপ ত্যাগ করে স্বর্ণপিণ্ডেই পরিণত হয়। আবার সেই স্বর্ণপিণ্ডেরও প্রকৃতি মহাভূত—সে তাতেই বিলীন হবে। এইভাবে শেষ অবধি আমরা এক মূল প্রকৃতিতে পৌছাব।

কারিকাকার এইটিকেই (ক) কারণকার্য বিভাগাত্ ও (খ) অবিভাগাত্ বৈশ্বরূপ্যস্য বলে উল্লেখ করেছেন। এর থেকেই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে বিচিত্র ব্যক্ত সংসারের মূলে এক প্রকৃতিই কারণরূপে বিরাজিত।

আরও বিবেচ্য এই যে কারণে নিহিত শক্তিজন্যই কার্যটি পরিণত বা অভিব্যক্ত হয়। এই 'শক্তি' বলতে কী বুঝবো? আমরা দেখি যে বালি পিষলে তেল বার হয় না অথচ তিল পিষলে তেল বার হয়। এ থেকেই বোঝা উচিত যে তিলে তৈল অব্যক্ত অবস্থায় নিহিত আছে, বালিতে নেই। কার্য-বিশেষের কারণবিশেষে এই অব্যক্ত অবস্থানকেই কারণের শক্তি বলে স্বীকার করতে হবে। আর এই শক্তি স্বীকার করলেই কার্যের কারণ তারও কারণ এইভাবে খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে ব্যক্ত জগতের মূল কারণরূপে অব্যক্ত-

প্রকৃতিকে স্বীকার করতে হবে। কারিকায় এই যুক্তিটিই হ'ল শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ।

যদি আপত্তি ওঠে যে উপরে যে তিনটি যুক্তি দেওয়া হ'ল তাদের বলে বড়-জোর এই বলা যায় ক্রমশঃ পিছনে যেতে যেতে আমরা মহৎ তত্ত্বে পৌঁছলাম। কিন্তু তারও পিছনে গিয়ে অব্যক্ত সূক্ষ্ম প্রকৃতিকে স্বীকার করার পক্ষে কী যুক্তি থাকতে পারে? তার উত্তরে কারিকাকার বলছেন যে জগতের বিভিন্ন বস্তুগুলি সকলেই পরিমিত। এই পরিমিতি বলতে কিন্তু দেশকালে পরিমিতি বোঝায় না কেন না সাংখ্যমতে কাল পৃথক্ পদার্থরূপে স্বীকৃত হয় না। কাল বিকৃতি-গুলির উপাধিমাত্র। এবং যেহেতু প্রকৃতি সর্বব্যাপী সে দেশেও পরিমিত হতে পারে না। অতএব 'ভেদগুলি পরিমিত' বলতে ঈশ্বরকৃষ্ণ বুঝিয়েছেন যে সেগুলি অনন্যাধীন বা স্বতন্ত্র নয়। তাদের প্রত্যেকেরই ব্যাখ্যার জন্য অপর কোনও কিছুর অপেক্ষা থাকে। অতএব ভিন্ন ভিন্ন পরতন্ত্র বস্তুগুলির কারণ অনুসন্ধান করতে করতে অবশেষে আমাদের স্বতন্ত্র অবিভক্ত এক প্রকৃতিতে পৌঁছতেই হবে। কারিকাতে এই যুক্তিটিই 'ভেদানাং পরিমাণাৎ' বলে উল্লিখিত হয়েছে।

যদি আপত্তি ওঠে যে বিচিত্র ভিন্নবস্তুর মূলে এক কারণ অপেক্ষা একাধিক কারণ স্বীকার করাই তো যুক্তিযুক্ত তারই উত্তরে কারিকাকার বললেন 'সমন্বয়াত্'। অর্থাৎ পার্থক্য সত্ত্বেও ভিন্ন কার্যগুলির মধ্যে মৌলিক সমন্বয় বা সাদৃশ্যও পাওয়া যায়। কেননা সকল বস্তুর মধ্যেই প্রীতি, অপ্রীতি ও বিষাদ বা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ লক্ষিত হয়। সুতরাং তাদের মূল কারণও ঐ ত্রিগুণাত্মিকাই হবে—সৎকার্যবাদ মতে সেইটিই যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত।

ত্রিগুণা প্রকৃতির পরিণাম বা অভিব্যক্তি

অতএব সাংখ্যসিদ্ধান্ত হ'ল যে এক ত্রিগুণাত্মিকা নিত্যা, জড়া প্রকৃতিই জগৎকারণ। প্রসঙ্গত প্রকৃতির এই তিনগুণের বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন। সাংখ্যের পরিভাষায় 'গুণ' পদের অর্থ ন্যায়বৈশেষিকসম্মত 'গুণ' পদার্থের থেকে পৃথক্। ন্যায়বৈশেষিক মতে গুণ দ্রব্যাশ্রিত ও অগুণ। অর্থাৎ গুণ নিরালম্ব থাকতে পারে না এবং গুণের গুণ নেই। কিন্তু সাংখ্যে যাকে গুণ বলা হয়েছে তা প্রকৃতির ধর্ম নয়—এগুলি প্রকৃতির আত্মস্বরূপ। এই গুণগুলি দিয়েই প্রকৃতি সমন্বিত—যেমন রেশমের বা পশমের সুতা পাকানোর সময় আমরা দুই-

গুণ বা তিনগুণ বা চারগুণ তত্ত্ব ব্যবহার করি প্রকৃতিকেও তেমনই তিনটি গুণেরই সাম্যাবস্থা বলে বুঝতে হবে। এই গুণগুলির আবার বিশেষ স্বভাব আছে। যেমন সত্ত্বগুণ লঘু, প্রকাশক, তমোগুণ গুরু বারণক ইত্যাদি। সাংখ্যের ত্রিগুণের পারিভাষিক নাম সত্ত্ব, রজস্ ও তমস্। আদিতে এই তিনগুণ কেউ কারুকে অভিভূত না করে সাম্যাবস্থায় থাকে। পরে ক্রমে তারা পরস্পরকে অভিভূতও করে আবার পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতাও করে। এই ভাবেই ব্যক্ত সংসারের শুরু হয়। সংসারের ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে এই গুণগুলি ভিন্ন ভিন্ন অনুপাতে উপস্থিত থাকে। যেমন আদর্শ অথবা আয়নাতে সত্ত্বগুণের আনুপাতিক আধিক্যহেতু আয়না স্বচ্ছ, প্রকাশক ও প্রীতিজনক। আবার দ্বেষান্ধ চিত্ত তমোগুণের আধিক্য হেতু গুরু বিষণ্ণ ও আচ্ছন্ন। সত্ত্ব ও তমোগুণ আপনা হতে সক্রিয় হতে পারে না। রজোগুণই সচল এবং রজস্ই সত্ত্ব ও তমস্কে উপষ্টম্ভিত করে। চলমান স্বভাবের জন্য রজোগুণ অপ্রীতি বা দুঃখজনক। সত্ত্বগুণ শুক্লবর্ণ, রজোগুণ লোহিতবর্ণ এবং তমোগুণ কৃষ্ণবর্ণ। জগতের সকল বস্তুতেই এই ত্রিগুণ বর্তমান তাই তারা সুখদুঃখ এবং মোহজনক। যেমন সুন্দরী ষোড়শী তার প্রেমিকের চিত্তে সুখ, অন্য যুবকের চিত্তে দুঃখ ও কাহারও চিত্তে বিষাদ সৃষ্টি করে। বিশেষ লক্ষণীয় যে সাংখ্যকার সুখদুঃখ ও বিষাদকে বিষয়নিষ্ঠ বলেছেন—বিষয়ীনিষ্ঠ বলেন নি। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানে কিন্তু সুখদুঃখাদি মানবমনেরই অবস্থা বলে বিবেচিত হয়। এই মতে জাগতিক বিষয়গুলিতে মনোনিরপেক্ষ ভাবে সুখদুঃখাদি থাকে না—এমন কি মনোসাপেক্ষেও থাকে না। তবে মনে সুখদুঃখাদি উৎপন্ন করতে হ'লে বিষয়ভোগ বা অন্ততঃ কল্পিত বিষয়ভোগ করতে হবে। অর্থাৎ পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানমতে বিষয়ে সুখও নাই দুঃখও নাই বিষাদও নাই—এ সবই আছে বিষয়ীতে। সাধারণভাবেও চিন্তা করলে মনে হয় সুখদুঃখাদি তো আমাতেই আছে—বিষয়ে তো নাই। বিষয়ে যদি থাকতো তবে তো মালাটি গলায় পরে 'আমি সুখী' না বলে বলতাম 'মালাটি সুখী'—তা তো বলি না। উত্তরে সাংখ্যাচার্যগণ বলেন যেমন পেঁচা সূর্যমণ্ডলে অন্ধকার দেখে তেমন অমুক্ত পুরুষ আত্মায় ত্রিগুণ আরোপ করে। আসলে ঐ তিনগুণ আছে প্রকৃতিতে অর্থাৎ বিষয়ে। এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্ন ওঠে—এই যে পরস্পরবিরোধী গুণগুলি, এরা সুন্দ উপসুন্দের মত পরস্পরকে ধ্বংস করে না ফেলে সহযোগিতা যে করবেই তার নিশ্চয়তা কোথায়? উত্তরে সাংখ্যাচার্যগণ বলেন যে তেল,

সলিতা এবং অগ্নি এরা তো পরস্পর বিরুদ্ধ—কিন্তু একত্র মিলিত হয়ে আলো জ্বালিয়ে বস্তুবর্গের রঙ প্রকাশ করে। আরও দৃষ্টান্ত বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা এগুলি পরস্পরবিরোধী হয়েও শরীরধারণরূপ কার্য করে। সেইরকমই প্রকৃতির তিনটি গুণ সত্ত্ব, রজস্‌ ও তমস্‌ পরস্পরবিরোধী হয়েও এক প্রয়োজন সিদ্ধ করার জন্য পরস্পরের সহযোগিতা করে। সেই মুখ্য প্রয়োজন হ'ল পুরুষের ভোগ ও মুক্তি।

এই তিন গুণ জগতের যাবতীয় বস্তুতে দেখা যায় বলে সৎকার্যবাদী সাংখ্যাচার্যরা বলেন যে কার্য জগতের কারণ প্রকৃতিও ত্রিগুণাত্মিকা কেন না তাঁদের মতে কার্য উৎপত্তির পূর্বে কারণে অব্যক্ত অবস্থায় থাকে।

সৎকার্যবাদ ও অবয়ব-অবয়বী বিচার

প্রকৃতিতত্ত্বের সপক্ষে যে যুক্তি দেওয়া হয়েছে সেগুলি অনুধাবন করলে বার বার দেখা যায় যে প্রসঙ্গত সৎকার্যবাদের কথা এসেই পড়ে। সুতরাং এই সৎকার্যবাদের বিশদ আলোচনা হওয়া উচিত। কার্যকারণ বিষয়ে ভারতীয় দর্শনে মোটামুটি চার রকমের মত আছে :—

(ক) অসৎ কারণ হতে সৎকার্য উৎপন্ন হয় (বৌদ্ধমত)

(খ) এক সতের বিবর্ত যে কার্য তা সদ্বস্তুও নয়, অসৎও নয়—অতএব সৎ কারণ হ'তে অনির্বচনীয় কার্য বিবর্তিত হয় (বেদান্তমত)

(গ) সৎ কারণ হতে উৎপত্তির প্রাক্কালে অসৎ কার্য উৎপন্ন হয় (ন্যায়-বৈশেষিকমত)

(ঘ) সৎ কারণ হতে সৎকার্য উৎপন্ন হয় (সাংখ্যমত)।

এই চতুর্থকল্পটি সাংখ্যসিদ্ধান্ত সৎকার্যবাদ নামে পরিচিত। এর সমর্থনে কারিকাকার নিম্নোক্ত পাঁচটি যুক্তি দিয়াছেন :—

> অসদকরণাদুপাদানগ্রহণাত্‌ সর্বসম্ভবাভাবাত্‌।
>
> শক্তস্য শক্যকরণাত্‌ কারণভাবাচ্চ সত্‌কার্যম্‌ ॥ ৯ ॥

অর্থাৎ উৎপন্ন বা ব্যক্ত হবার পূর্বেই কার্যটি কারণে থাকে কেন না (১) যা অসৎ তা উৎপন্ন হয় না (২) কার্যের সঙ্গে কারণের সম্বন্ধ থাকে (৩) সব কিছুই সম্ভব নয় (৪) কেবলমাত্র শক্তিমানই শক্যের কারণ হতে পারে (৫) কার্যটির স্বভাব কারণের স্বভাবেরই অনুরূপ হয়। এই পাঁচটি যুক্তিকে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে ঈশ্বরকৃষ্ণ কেমন করে পূর্বপক্ষকে খণ্ডন করে তাঁর সিদ্ধান্ত

স্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। প্রথমত বৌদ্ধরা বলেন যে অসৎকারণ হতে সৎকার্যের উৎপত্তি হয় তার সপক্ষে তাঁরা দৃষ্টান্ত দেখান যে বীজের বিনাশ হতে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয়, মৃৎপিণ্ড বিনষ্ট হলে তবে ঘট উৎপন্ন হয়। উত্তরে সাংখ্যাচার্যগণ বলেন যে 'বিনাশের' কোনও কার্যোৎপাদন ক্ষমতা থাকতে পারে না। বীজ মৃৎপিণ্ড ইত্যাদি ভাববস্তুরই কার্যোৎপাদন সামর্থ্য আছে। বিনাশ তো অভাব, অবস্তু। বিনাশ হতে যদি বস্তু উৎপন্ন হতে পারত তাহলে কত বিনাশ বা অভাব জগতের সর্বত্র রয়েছে—তাহলে জগতে সর্বত্রই সব কার্য উৎপন্ন হতে পারত। তা তো হয় না। সুতরাং অসৎ হতে সৎ উৎপন্ন হয় এ মত গ্রাহ্য নয়।

বৈদান্তিকরা যে জগৎকার্যকে মায়িক বলেন সাংখ্যাচার্যগণ তা স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন যে জগৎ যে সদ্বস্তু নয় একথা স্বীকারের পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি নেই। অতএব সৎ কারণ হতে অনির্বচনীয় কার্য উৎপন্ন হয় এ মতও গ্রাহ্য নয়।

ন্যায়বৈশেষিক মতে উৎপত্তির পূর্বে কারণে কর্যের প্রাগভাব থাকে। তাঁদের মতে কার্য যদি কারণে পূর্ব হতেই থাকে তাহলে কার্য উৎপন্ন হ'ল একথা বলা নিরর্থক হয়ে যায়। 'অবয়বী' একটি নূতন আরম্ভ—এটি অবয়ব অতিরিক্ত। আরও বিবেচ্য এই যে ঘটপটাদি যদি মৃৎপিণ্ড, তন্তু ইত্যাদিতে আগে হতেই থাকে তাহলে তো কুম্ভকার তন্তুবায় ইত্যাদির আর করার কিছু থাকে না—তাঁরা কি তাহ'লে কৃতকার্যই আবার করছেন?

এর উত্তরে বাচস্পতি তাঁর তত্ত্বকৌমুদীতে বলেছেন যে অসৎকে উৎপন্ন করা অসম্ভব। শত-সহস্র শিল্পীর সমবেত প্রচেষ্টাতেও নীল কখনও পীত হবে না।

অতএব সাংখ্যসিদ্ধান্তই ঠিক যে কারণে কার্য উৎপত্তির পূর্ব হতেই অব্যক্ত অবস্থায় থাকে। কুম্ভকার তন্তুবায়াদি সেই অব্যক্ত কার্যকে ব্যক্ত করেন মাত্র। আমাদের অভিজ্ঞতায় এ রকম অব্যক্তের ব্যক্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত অনেক আসে—যেমন তিল পিষলে তৈল ব্যক্ত হয়—ধান ভানলে চাউল ব্যক্ত হয়। গাভীকে দোহন করলে দুধ ব্যক্ত হয় ইত্যাদি। কেউই বলবে না যে ঐ তৈল, চাউল বা দুধ আগে হতে তিলে, ধানে বা গাভীতে ছিল না। যদি না থাকত তো আমরা যাই করি না কেন, তৈল, চাউল, দুধ ওভাবে পেতাম না। ইত্যাকার

বিবেচনায় কারিকাকার প্রথম যুক্তিটি দিলেন, অসদকরণাৎ—যা অসৎ তা কখনও উৎপন্ন হয় না।

দ্বিতীয় যুক্তিটি হ'ল 'উপাদানগ্রহণাৎ'—উপাদানের অর্থ কারণ এবং গ্রহণের অর্থ কার্যের সঙ্গে সম্বন্ধ। কারিকাকার বলছেন যে কারণের সঙ্গে কার্যের একটি বিশেষ সম্বন্ধ থাকে। অর্থাৎ কার্যের সঙ্গে সম্বন্ধ হয়েই কারণটি কার্যকে উৎপন্ন করতে পারে। কার্য যদি অসৎই হয় তবে কারণ তার সঙ্গে সম্বন্ধ হবে কি করে? যদি আপত্তি তোলা হয় যে কারণের সঙ্গে সম্বন্ধ না হয়েই কার্য উৎপন্ন হতে বাধা কি? সুতরাং উৎপত্তির পূর্বে কার্য অসৎ এই মত স্বীকার করলেও দোষ নেই। এর উত্তরেই কারিকাকার তৃতীয় যুক্তিটি দিয়েছেন—সর্বসম্ভবাভাবাৎ।

যদি কার্যটি কারণের সঙ্গে সম্বন্ধ না হয়েই উৎপন্ন হতে পারত তবে তো যে কোনও কারণ থেকেই যে কোনও কার্য উৎপন্ন হ'ত কেননা সব কার্যই তো কারণটির সঙ্গে অসম্বন্ধ। সে হিসাবে যে কোনও কারণ থেকে যে কোনও কার্যের উৎপত্তির বাধা কোথায়? কিন্তু সংসারে এ রকম অব্যবস্থা দেখা যায় না। কোন্ কারণ থেকে কোন্ কার্য হবে তার ব্যবস্থা ঠিক আছে। এই কথাটিই সাংখ্যাচার্যগণ বলতে চেয়েছেন যখন তাঁরা বলেন যে কারণের সঙ্গে কার্যের একটি বিশেষ সম্বন্ধ আছে। কারণগুলি সৎকার্যের সঙ্গে সম্বন্ধ হয়, অসৎ কার্যের সঙ্গে সম্বন্ধ হতে পারে না। তিলে যে তৈল আছে তিল তার সঙ্গেই সম্বন্ধ হতে পারে—যে দধি নেই তার সঙ্গে সম্বন্ধ হতে পারে না। যে এটা মানবে না তাকে এই অদ্ভুত কথা স্বীকার করতে হবে যে, যে কোনও কারণ থেকেই কোন কার্যের উৎপত্তি সম্ভব।

এর উত্তরে আপত্তি তোলা হয় যে কার্যের সঙ্গে কারণের সম্বন্ধ থাকার কোনও প্রয়োজন নেই। যে কার্য উৎপন্ন করার সামর্থ্য কারণটির আছে সেই কার্যটিই সে উৎপন্ন করবে—আর কার্যটিকে উৎপন্ন হতে দেখলে কারণটির যে সেটি উৎপাদনের সামর্থ্য আছে এটা আমরা অনুমান করতে পারবো। সুতরাং অবাধে যে কোনও কারণ যে কোনও কার্য উৎপন্ন করতে পারবে এমন অসম্ভব কথা স্বীকার করবারও কোনও প্রয়োজন নেই। এরই উত্তর দিতে গিয়ে বাচস্পতি কৌমুদীটীকায় বলেছেন—একটা কথা স্বীকার করতে হবে যে কারণটির যে কার্যটি উৎপন্ন করার শক্তি আছে সে খালি সেটিই উৎপন্ন করতে পারে। অন্য কোনও কার্য সে উৎপন্ন করতে পারে না। এখন কারণে নিহিত

শক্তি যদি এইভাবে কেবল তার শক্য কার্যের উপরই ক্রিয়া করতে সমর্থ হয় তবে স্বীকার করতে হবে যে শক্তিবিশেষ শক্যবিশেষের সঙ্গেই সম্বদ্ধ। নচেৎ বিশেষ কারণের সঙ্গে বিশেষ কার্যের সম্বন্ধের কোনও ব্যবস্থা হয় না। এটি কারিকাকারের চতুর্থ যুক্তি—শক্তস্য শক্যকরণাত্।

পঞ্চম যুক্তি হ'ল কারণভাবাত্ চ। কার্যের সঙ্গে কারণের স্বভাবের মিল আছে। অবয়বীর স্বাতন্ত্র্যবাদী নৈয়ায়িকদের সঙ্গে সাংখ্যশাস্ত্রকারদের এখানে ঘোর মতভেদ আছে। সাংখ্যাচার্যগণ বলেন—(ক) কাপড়টি সুতা হতে ভিন্ন নয় কারণ পট বা কাপড় তো তন্তুধর্মক। তন্তুরও যা ধর্ম পটেরও সেই ধর্ম। তন্তু যদি সূক্ষ্ম হয় পটও সূক্ষ্ম হবে—তন্তু যদি কাষায় হয় পটও তাই হবে।

(খ) পট যদি তন্তু হতে ভিন্ন হত তাহলে তন্তু উপাদান আর পট উপাদেয় হত না। রৌপ্যকে উপাদান করে কি স্বর্ণালঙ্কার রূপ উপাদেয় উৎপন্ন করা যায়?

(গ) তন্তু ও পট ভিন্ন নয় কেন না তাদের মধ্যে সংযোগও হয় না অপ্রাপ্তিও হয় না। কুয়ো আর বালতি ভিন্ন কেন না তাদের মধ্যে সংযোগ হতে পারে। হিমালয় আর বিন্ধ্য ভিন্ন কেন না তাদের মধ্যে অপ্রাপ্তি রয়েছে; কিন্তু তন্তু আর পট তো এ রকম নয়।

(ঘ) পটটি তন্তুর থেকে ভিন্ন নয় কেন না পটটি প্রস্তুত করতে যত তন্তু লেগেছে তাদের যা ওজন পট বা কাপড়টির ওজন ঠিক তাই—কমও নয় বেশীও নয়। তন্তু আর পট যদি এইভাবে অভিন্ন বলে প্রমাণিত হয় তবে বলতে হবে যে পটটি আর কিছুই নয় শুধু তন্তুগুলিকে বিশেষভাবে সাজিয়ে নেওয়া মাত্র। স্বভাবে কার্য ও কারণের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই।

আরম্ভবাদীরা বিপক্ষে যুক্তি দেন যে তন্তুগুলি কারণ আর পটটি কার্য। এদের মধ্যে যদি কোনও ভেদ না থাকে তবে আমরা কেন বলি যে কার্য পটটি কারণ তন্তুগুলি হতে উৎপন্ন হয়েছে—এখানে তো দুটি ভিন্ন বস্তুর কথাই বলা হ'ল। ঐ দুটি যদি ভিন্ন না হত তো তাদের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ হত কি করে? সম্বন্ধ হতে গেলে অন্তত দুটি সম্বন্ধী লাগে—একটিতে হয় না। এ ছাড়াও তন্তু আর পট যদি অভিন্নই হবে তবে তন্তু দিয়ে লজ্জা নিবারণ হয় না অথচ পট দিয়ে হয় কেন? আবার পটটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে যখন সুতা বার করি তখন বস্ত্রটি ছেঁড়া হয় কিন্তু সুতাগুলি আস্ত থাকে। তন্তু ও পট অভিন্ন

কুলে একই বস্তু ছিন্নও হয় অক্ষতও হয় এমন স্ববিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত স্বীকার করতে হয়। এইসব আপত্তির উত্তরে বাচস্পতি মিশ্র তাঁর তত্ত্বকৌমুদী টীকায় বলেছেন যে নূতন কিছু আরম্ভ হ'ল না বলে আমরা যদি আবির্ভাব এবং তিরোভাবের কথা বলি তাহলেই উল্লিখিত সব আপত্তির উত্তর দেওয়া হয়। কূর্মের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি যখন পৃষ্ঠাবরণের তলা হতে বার হয়ে আসে আমরা বলি না যে ঐ অঙ্গগুলি উৎপন্ন হ'ল। আবার যখন কূর্মটি তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গুটিয়ে নেয় তখনও বলি না যে সেগুলি ধ্বংস হয়ে গেল। গীতায় বলা হয়েছে—
নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ নাভাবো বিদ্যতে সতঃ। ভগবদ্গীতা ২।১৬॥

আমরা তো কত সময় বলি এই বনে অনেক শালগাছ আছে—কিন্তু শাল গাছগুলি কি বন থেকে বা বনটি কি শালগাছগুলি হতে ভিন্ন? আর ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন সাধনের কথা যদি বলা হয় তবে সেই একই অগ্নি দগ্ধ করে, পাক করে, আলোকিতও করে। আবার এককভাবে যে কাজ করা দুঃসাধ্য যূথবদ্ধ হ'লে তাই সুসাধ্য হয়ে যায়। যেমন একজনে পাল্কি বইতে পারে না—কিন্তু চার বেহারা মিলিতভাবে পারে। একটি তন্তু লজ্জানিবারণ করতে পারে না—কিন্তু অনেক তন্তু মিলিতভাবে বস্ত্ররূপে তা পারে।

সুতরাং সাংখ্যকার এই সিদ্ধান্তে পৌছলেন যে কার্যটি উৎপন্ন হওয়ার অর্থ হ'ল কারণে যা অব্যক্তরূপে ছিল কার্যে তা ব্যক্তরূপে আবির্ভূত হ'ল। কার্যটি ধ্বংস হ'ল মানে তার প্রকৃতিতে তিরোভূত হ'ল।

ন্যায়াচার্যগণ অবশ্য কূটতর্ক তুলেছেন যে 'আবির্ভাব' তো একটি নূতন কিছু। যদি এটির উৎপত্তি স্বীকার করি তবে তো বলতে হবে যে যা ছিল না তাই উৎপন্ন হ'ল। আর যদি বলা যায় যে 'আবির্ভাব' আগে হতেই ছিল—কারণের ক্রিয়ার ফলে সেই আবির্ভাব আবির্ভূত হয়েছে—তাহলে এই দ্বিতীয় আবির্ভাবের আবার আবির্ভাব হতে হবে। এই করে পিছনে চলতে চলতে কোথাও থামতে না পেরে অনবস্থা দোষ ঘটবে। এর উত্তরে বাচস্পতি বলেছেন যে এই আপত্তি তো ন্যায়বৈশেষিক মতের বিরুদ্ধেও তোলা যায়। সাংখ্যে যেমন আবির্ভাবের কথা বলা হয় ন্যায়বৈশেষিক সিদ্ধান্তে তেমন নূতন আরম্ভের বা সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। ঐ সৃষ্টির যদি প্রাগভাব থাকে তাহলে তো তারও সৃষ্টির প্রয়োজন হবে। এইভাবে সৃষ্টির সৃষ্টি তার সৃষ্টি ক্রমে অনবস্থা দোষই ঘটবে। সুতরাং একথা মেনে নেওয়াই ভাল যে আবির্ভাবের

আর কোনও কারণের প্রয়োজন নেই। এই সৎকার্যবাদই প্রকৃতিতত্ত্ব স্বীকারের পক্ষে যত যুক্তি আছে তার মূল ভিত্তি।

প্রকৃতির ক্রমিক অভিব্যক্তি

সাংখ্যমতে প্রকৃতি নিত্যপরিণামী। গুণত্রয় যখন পরস্পরকে অভিভূত না করে সাম্যাবস্থায় থাকে তখনও তারা পরিণতই হতে থাকে। তবে সে সময় যে পরিণাম ঘটে তাকে বলে স্বরূপ পরিণাম। পুরুষসন্নিধিবশত প্রকৃতিতে গুণবিক্ষোভ আরম্ভ হয়। পুরুষসন্নিধি যে প্রকৃতির পরিণামের বা অভিব্যক্তির হেতু এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হবার পূর্বে সাংখ্যাচার্যগণ বিকল্প ব্যাখ্যাগুলির ত্রুটি দেখিয়ে নিরস্ত করেছেন। এই বিকল্পগুলি হচ্ছে (ক) কাল (খ) স্বভাব (গ) নিয়তি (ঘ) যদৃচ্ছা (ঙ) ভূতবর্গ (চ) যোনি (ছ) পুরুষ—এইগুলির মধ্যে এক বা একাধিক সংসারের কারণ।

(ক) কাল তো প্রকৃতির অঙ্গ—কারণ বুদ্ধির প্রকাশ কালিক এবং বুদ্ধি-নিরপেক্ষভাবে কালের কোনও সত্তা নাই—সাংখ্যের সিদ্ধান্ত এই। বুদ্ধি তো প্রকৃতির অন্যতম বিকৃতি বা অভিব্যক্তি। অতএব নিজেরই বিকৃতির স্বভাব হতে নিজের উৎপত্তি এ কেমন করে স্বীকার করা যায়। অতএব ন্যায়ে যে বলা হয়েছে জন্যানাং জনক: কালঃ—সাংখ্য সে মত অস্বীকার করেছেন।

(খ ও গ) স্বভাব ও নিয়তি প্রাকৃতিক ঘটনাগুলিরই ধর্ম। প্রকৃতিতে যে নিয়ম দেখা যায় বুদ্ধি এবং সংসার নিরপেক্ষভাবে তার কোনও অর্থ নাই। অতএব এই দুই মতও গ্রাহ্য নয়।

(ঘ) যদৃচ্ছা বা অকস্মাৎ সংসারের আরম্ভ হয়েছে এই সিদ্ধান্তের বিপক্ষে আপত্তি এই যে এটিকে গ্রহণ করলে কার্যকারণভাবকে অস্বীকার করতে হয়। বুদ্ধির পক্ষে কার্যকারণভাবকে অস্বীকার করে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। অতএব এভাবে জগতের ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না।

(ঙ) ভূতবর্গ বা ভৌতিক পরমাণুগুলিই সংসারোৎপত্তির মূল এই মতের বিপক্ষে সাংখ্যমতে যুক্তি এই যে পরমাণুগুলি তো সংসারেরই অন্তর্ভূত। অতএব সংসারের ব্যাখ্যা পরমাণু দিয়ে করার অর্থ দাঁড়ায় যে সংসারই সংসারের কারণ। সেক্ষেত্রে কারণরূপে কল্পিত সংসারের পুনরায় কারণ কল্পনা করার প্রয়োজন ঘটবে। এইভাবে ব্যাখ্যার আর অন্ত পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ পরমাণুগুলি অব্যাপি সুতরাং তারা কার্য। কার্যমাত্রেরই

কারণস্বীকার আবশ্যক। এইজন্য পরমাণু মূল কারণ হতে পারে না। আরও বিবেচ্য এই যে পরমাণুগুলি বিশেষ—যেমন জলীয় পরমাণুর সঙ্গে পার্থিব পরমাণুর ভেদ আছে। তাবৎ বিশেষ পরমাণু যে সামান্য কারণে অবিশেষরূপে বিদ্যমান সেই মূল কারণ পরমাণু হতে পারে না।

(চ) যোনি বা শক্তি বিষয়ে সাংখ্যের আপত্তি এই যে শক্তি কারণগত কার্যের অবস্থার অতিরিক্ত আর কিছুই নয়। সুতরাং শক্তি স্বীকার করলে একটি স্বতন্ত্র তত্ত্ব স্বীকার করা হয় না—পরন্তু মহদাদি সকল কার্যের অব্যক্ত অবস্থারূপে মূলা প্রকৃতিকেই স্বীকার করা হয়।

(ছ) তবে কি পুরুষই সংসারোৎপত্তির কারণ? এই মতের বিপক্ষে দুইটি যুক্তি আছে। প্রথমত চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ অকর্তা—দ্বিতীয়ত দুঃখময় সংসার সৃজন করবার প্রবৃত্তি পুরুষের হবে কেন?

অতএব সাংখ্যকার মনে করেন পুরুষসন্নিধিমাত্র প্রকৃতির ব্যক্ত হবার কারণ। এই 'সন্নিধি' শব্দটির কোনও দৈশিক বা কালিক ব্যঞ্জনা থাকতে পারে না। কেন না পুরুষ বা প্রকৃতি কেউই দেশে বা কালে নাই। এই 'সন্নিধি' অর্থে প্রকৃতির অভিব্যক্তির অনুকূল এক সম্বন্ধবিশেষকে বুঝতে হবে। এই সন্নিধির ফলে পুরুষের ভোগ ও কৈবল্যার্থ প্রকৃতির বিরূপ পরিণাম আরম্ভ হয় এবং অন্ধ ও খঞ্জ ব্যক্তিদ্বয় যেমন পরস্পরের সহযোগিতায় অরণ্য হতে বাহিরে আসার পথ খুঁজে বার করে তেমনই অন্ধ অচেতন অথচ কর্ত্রী প্রকৃতি এবং চেতন কিন্তু পঙ্গু অকর্তা পুরুষ পরস্পরের সহযোগিতায় সংসারবন্ধন হতে মুক্ত হয়। প্রকৃতির এই বিরূপ পরিণামের একটি ক্রম সাংখ্যশাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতি বা প্রধানের প্রথম বিকৃতি হ'ল মহৎ—এরই অপর নাম বুদ্ধি। বুদ্ধির অর্থ হ'ল অধ্যবসায়। অধ্যবসায় বলতে আমরা বুঝি নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান। নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের আকার হ'ল—'আমি', 'আমি আছি', 'বস্তু', 'বস্তু আছে', 'এইটি আমার কৃতিসাধ্য'—ইত্যাদি। নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের সমষ্টিই হ'ল মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব শব্দের অভিধেয়। এই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির সঙ্গে যে অহং বা আমি সংলগ্ন থাকে সেটিই বুদ্ধির পরবর্তী পরিণাম। এই অহঙ্কার বা অহংতত্ত্বের আমি হচ্ছে জীবাত্মা। অহঙ্কারতত্ত্বের সাত্ত্বিক বিকৃতি একাদশ ইন্দ্রিয়—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও মন। আর এর তামসিক বিকৃতি হ'ল পঞ্চ তন্মাত্র—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। ইন্দ্রিয়গুলি সাত্ত্বিক বিকার—সুতরাং তারা লঘু এবং স্বচ্ছ ও প্রকাশস্বভাব। তন্মাত্রগুলি

তামসিক—সুতরাং গুরু এবং অস্বচ্ছ ও অপ্রকাশস্বভাব। জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি—চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, রসন, ত্বক্। কর্মেন্দ্রিয় পাঁচটি—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ। সাংখ্যমতে মন ইন্দ্রিয় এবং উভয়াত্মক অর্থাৎ একাধারে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়। এরকম বলার কারণ হচ্ছে যে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় কেউই মনের অধীন না হয়ে কাজ করতে পারে না। মন যখন যে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হয় তখন তাকে দিয়ে কাজ করায়। চোখের সামনে বস্তু থাকলেও মনোযোগ না দিলে আমরা সেটি দেখতে পাই না। মনোযোগ না হ'লে শব্দও শুনি না রসও গ্রহণ করি না। মন না চালনা করলে হাত পাও চলে না। অতএব মন উভয়েন্দ্রিয়। বস্তুগুলি যখন প্রথম ইন্দ্রিয়ের সমীপবর্তী হয় তখন আমাদের বালমূকাদির—জ্ঞানের ন্যায় একপ্রকার অস্পষ্ট জ্ঞান হয়। তারপর ইন্দ্রিয় যখন ঐ বস্তুর প্রতিবিম্বকে মনের নিকট সমর্পণ করে তখন 'এ বস্তু অমুক প্রকার' এই আকারে সঙ্কল্পক জ্ঞান হয়। প্রথম স্তরের জ্ঞানকে সম্মুগ্ধ বা আলোচন জ্ঞান নামে অভিহিত করা হয়। দ্বিতীয় স্তরের জ্ঞানের নাম 'বিবেচন জ্ঞান'।

সাংখ্যমতে 'মন' 'বুদ্ধি' ও 'অহংকার' এই তিনটিই হল 'অন্তঃকরণ' শব্দের অভিধেয়। বাহ্যকরণগুলি শুধুমাত্র বর্তমান বস্তুরই গ্রাহক কিন্তু অন্তঃকরণ ত্রিকালাবস্থিত বস্তুর পরীক্ষক ও গ্রাহক। মন কল্পনাশক্তির সাহায্যে সবকিছুকেই গ্রহণ করতে পারে। মনের প্রভাবেই আমাদের বাগিন্দ্রিয় ত্রৈকালিক বস্তুসকলের উপর আধিপত্য করে—অর্থাৎ আমরা কল্পনাশক্তির সাহায্যেই বর্তমান ছাড়াও ভূত ও ভবিষ্যৎ কাল সম্পর্কেও বাক্য ব্যবহার করতে পারি। অন্তঃকরণের সাহায্য ব্যতীত বাহ্যকরণগুলি ক্রিয়া করতে পারে না। কিন্তু বাহ্যকরণ একেবারে নষ্ট হয়ে গেলেও পূর্বশ্রুত পূর্বদৃষ্ট বিষয় সম্পর্কে অন্তঃকরণ কল্পনা করতে ও বাক্যব্যবহার প্রণোদিত করতে পারে। আবার বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলির প্রত্যেকেরই স্ব স্ব অধিকার আছে—সেই অধিকারের বাইরে তারা ক্রিয়া করতে পারে না। চক্ষু শ্রবণ করে না, ত্বক্ গন্ধ গ্রহণ করে না, হস্তপদাদি বাক্য উচ্চারণ করতে পারে না, বাগ্‌যন্ত্র জিনিষ তুলতে বা হাঁটতে পারে না। কিন্তু মন কোনও বিশেষ অধিকারে সীমাবদ্ধ নয়। মনের সকল বিষয়েই অধিকার আছে। তাছাড়া সাংখ্যশাস্ত্রে সব ইন্দ্রিয়েরই গোলক বা আশ্রয়স্থল নির্দিষ্ট আছে—যেমন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গোলক দৃশ্যমান চক্ষুতারকা ইত্যাদি। কিন্তু ঐ শাস্ত্রে মনের কোনও গোলক নির্দিষ্ট করা হয়নি। এই

মন ও অহঙ্কারের উপর বুদ্ধি ইচ্ছারূপে আধিপত্য করে। কেন না মন ও অহঙ্কার মিলিতভাবে 'আমি অমুক বস্তুকে জানি' বলে বুদ্ধির কাছে তাকে সমর্পণ করে এবং বুদ্ধিই ইচ্ছারূপে প্রকৃতি পুরুষে সূক্ষ্ম ভেদ নির্ণয় করে। মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এইভাবেই প্রদীপের তেল, সলিতা ও আগুনের মত পরস্পরের সহযোগিতা করে। সাংখ্যমতে মন ও বুদ্ধি আত্মা হ'তে ভিন্ন। মন অনিত্য ও বিকারী। এর জন্ম, বৃদ্ধি, ক্ষয়, পরিণাম ও নাশ আছে। মনের অবয়বও আছে নিশ্চয় নচেৎ মন কিছুর সঙ্গে সংযুক্ত হ'ত কী করে? মন অনিত্য বটে তবে ক্ষণধ্বংসী নয়—জীবের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত মন জীবিত থাকে।

অহংতত্ত্বের তামসিক বিকৃতি তন্মাত্র পাঁচ প্রকার। তন্মাত্র (তৎ + মাত্র) হচ্ছে অতি সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় বিশুদ্ধ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ এবং শব্দ। এরা প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় নয় কেন না এদের এমন কোনও বিশেষ ধর্ম (শান্ত, ধীর বা মূঢ়) নেই যাতে এরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিষয় হতে পারে। এই তন্মাত্রগুলির বিকার বা পরিণতিরূপে পঞ্চভূত আবির্ভূত হয় এবং সেগুলি সর্ব-সাধারণের জ্ঞানের বিষয়।

উপরে যে তত্ত্বগুলির তালিকা দেওয়া হ'ল তার মধ্যে মূলা প্রকৃতি কারও বিকৃতি নয় এবং পঞ্চভূত কারও প্রকৃতি নয়। এই দুইয়ের মধ্যে মহৎ, অহঙ্কার, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্রগুলি সকলেই প্রকৃতির বিকৃতি এবং বিকৃতির প্রকৃতি।

সাংখ্যশাস্ত্রে প্রকৃতি হতে সংসারের অভিব্যক্তির যে চিত্র দেওয়া হয়েছে তার সম্পর্কে পাশ্চাত্য পণ্ডিত জিমার (Zimmer) বড় মূল্যবান একটি মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন যে প্রাচীন হিন্দু কল্পনায় প্রলয়পয়োধিজলে ভাসমান ব্রহ্মাণ্ড হতে জগৎসৃষ্টির যে কল্পনা ছিল তা যেন নিতান্তই শিশুসুলভ। সাংখ্যই প্রথম তার একটি মনোবৈজ্ঞানিক রূপ দিল। আদিতে ছিল নির্বিকল্প আত্মস্থ অবস্থা; ক্রমে তা থেকে প্রকাশ পেল বুদ্ধি বা অবধারণ। এই বুদ্ধি অহং-ভাবেরও আগের অবস্থা। এ যেন মাত্র বিষয়ের অভিজ্ঞতা। এর আকার হ'ল—এইটি অমুক। এর পরেই আসে অহংকার—আমি জানছি, আমি করছি। এই অহং তত্ত্বের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে আসে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি, কর্মেন্দ্রিয়গুলি ও মন। তারা কাজ করে বহির্জগতের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ এবং তাদের আশ্রয় ভূতভৌতিকাদির উপর। এইভাবে কেন্দ্রীভূত শক্তির পর্যায়ক্রমে মানসিক পরিণতিই যেন বাহ্যজগতের পরিণতির সঙ্গে এক বলে সাংখ্যশাস্ত্রে

বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ জগৎসংসারকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সাংখ্যকার নিজের অভিজ্ঞতাকে মানসিক দিক থেকে ক্রমানুসারে বর্ণনা করেছেন। এরকমভাবে না দেখলে মনে হতে পারে যে সাংখ্যশাস্ত্রে জগতের ক্রমটি যেন উল্টো করে সাজানো হয়েছে।

পুরুষ

আমরা দেখলাম যে সাংখ্যাচার্যগণ জগৎকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তার মূলে শুধুই শুদ্ধচৈতন্য আছে একথা স্বীকার করলেন না। তাঁদের সিদ্ধান্ত হ'ল জড়-জগতের মূলে আছে নিত্যপরিণামী জড়া বিষয়রূপা সূক্ষ্মা এক অজা প্রকৃতি। কিন্তু শুধুমাত্র প্রকৃতিতত্ত্ব দিয়েই তো সবকিছুর ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। বিষয়ের কথা বলতে গেলেই বিষয়ীর কথা ওঠে। নিত্যপরিণাম বুঝতে গেলে তার পশ্চাৎপট হিসাবে অপরিণামী নির্বিকার দ্রষ্টার কথা বুঝতে হয়। অচেতন প্রকৃতিকে ভাসমান হতে হয় চৈতন্যের কাছে। সুতরাং সাংখ্যে দ্বিতীয় একটি তত্ত্ব স্বীকৃত হ'ল—পুরুষ। পুরুষ প্রকৃতির মতই অজ ও নিত্য কিন্তু আর সব দিক থেকেই সে প্রকৃতির ঠিক বিপরীত। এই তত্ত্ব স্বীকারের পক্ষে কারিকায় যুক্তি দেওয়া হয়েছে—

সংঘাতপরার্থত্বাত্‌ ত্রিগুণাদিবিপর্যয়াদধিষ্ঠানাত্‌।
পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ ॥ কা ১৭ ॥

অর্থাৎ পুরুষ বা শুদ্ধচৈতন্য আছে কেন না (ক) সকল সংঘাতই অপরের জন্য, অর্থাৎ অনেক অবয়ব সংহত করে যা সৃষ্ট হয় তা অপর কারুর প্রয়োজন সিদ্ধ করে। (খ) ত্রিগুণ যখন আছে তখন ত্রিগুণের বিপরীতও নিশ্চয় আছে। (গ) জড়বস্তুকে অধিষ্ঠাতাই নিয়ন্ত্রণ করেন। জড়া প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ। (ঘ) ভোগের জন্য ভোক্তার প্রয়োজন। সুখ দুঃখাদি-রূপ ভোগের ভোক্তা নিস্ত্রৈগুণ্য পুরুষ। (ঙ) কৈবল্যের প্রতি অর্থাৎ ত্রিগুণা প্রকৃতি হতে বিবিক্ত হয়ে সংসার হতে মুক্ত হবার দিকেও কারুর কারুর প্রবৃত্তি দেখা যায়। এই প্রবৃত্তি প্রকৃতির অতীত পুরুষের পক্ষেই সম্ভব।

এই যুক্তিগুলি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে যে জড়প্রকৃতিকে স্বীকার করেও সাংখ্যসিদ্ধান্ত কেন পুরোপুরি জড়বাদী হয়ে যায়নি।

প্রথম যুক্তি 'সংঘাতপরার্থত্বাত্‌'। যদি কেউ বলেন যে অব্যক্ত প্রকৃতি হতেই তো ব্যক্ত জগতের উৎপত্তির ব্যাখ্যা করা যায় তার উত্তরে কারিকাকার

বলেছেন যে প্রকৃতি, মহৎ বা বুদ্ধি, অহঙ্কার সবকিছুকেই সংঘাত বলতে হবে। এমন কি প্রকৃতিও ত্রিগুণের সংঘাত। আমাদের অভিজ্ঞতায় সংঘাত মাত্রই অপর কারুর প্রয়োজন সাধন করে। যেমন ইঁট কাঠ সাজিয়ে যে বাড়ি তৈরি হয় তাতে থাকেন গৃহস্বামী। ইঁট কাঠ তো আর নিজেরাই বাড়িতে থাকে না। সুতরাং প্রকৃতি এবং তার বিকৃতিগুলি সবই অন্যের প্রয়োজন সাধন করে। কিন্তু আপত্তি উঠতে পারে যে বাড়িতে বাস করে তো গৃহস্বামীর দেহ—দেহও তো একটি সংঘাত। সুতরাং একটি সংঘাত অপর একটি সংঘাতের প্রয়োজন সিদ্ধ করছে একথা বললে দোষ নেই। পুরুষের কথা তোলা এখানে নিষ্প্রয়োজন। এরই উত্তরে কারিকাকার দ্বিতীয় যুক্তি দিলেন—

'ত্রিগুণাদিবিপর্যয়াত্'। এক সংঘাত বস্তু যদি অপর এক সংঘাতের প্রয়োজন সাধন করে যেমন শয্যা যদি শয়ানপুরুষের প্রয়োজন সাধনোদ্দেশ্যেই প্রস্তুত হয়ে থাকে তাহলে যার প্রয়োজন সিদ্ধ হ'ল সে নিজেও একটি সংঘাত বলে অপর এক সংঘাতের প্রয়োজন সাধন করবে। এইরকম করে সংঘাতের আগে সংঘাত তারও আগে অপর সংঘাত ক্রমে পিছনে যেতে যেতে অনবস্থা দোষ হবে যদি না আমরা এক জায়গায় গিয়ে অসংঘাত ত্রিগুণমুক্ত, বিবেকী, অবিষয়, অসামান্য, চেতন, অপ্রসবধর্মী পুরুষকে স্বীকার করি। 'নিস্ত্রৈগুণ্য' স্বীকার করার অর্থই হ'ল প্রকৃতির বিপরীত কিছুকে স্বীকার করা।

আরও বিবেচনা করুন—প্রাকৃতিক জড়বস্তুগুলি নড়াচড়া করে বটে কিন্তু সেই নড়াচড়া তারা নিজেরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। অন্য কেউ তাদের নিয়ন্তা হয়ে নিজের উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্য যেমন যেমন নড়ানো দরকার তেমনই নড়ান। জগৎসংসার নিজের থেকে ভিন্ন নিস্ত্রৈগুণ্য চেতন কোনও অধিষ্ঠাতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এই মত স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত। কারিকাকার তাই বলছেন—'অধিষ্ঠানাত'।

এর পরের যুক্তি হল ভোগ্য থাকলেই ভোক্তা থাকতে হবে। ভোগ্য হচ্ছে সুখ দুঃখ ইত্যাদি। প্রত্যেকেই সুখকে অনুকূল এবং দুঃখকে প্রতিকূল বলে অনুভব করে। এই অনুকূলতা বা প্রতিকূলতা কে অনুভব করে? প্রকৃতি তো করতে পারে না। কেন না প্রকৃতি নিজেই তো সুখদুঃখাদি ত্রিগুণাত্মিকা। সুখ দুঃখ নিজেই নিজেকে অনুভব করবে সে তো অসম্ভব। সুতরাং ত্রিগুণাতীত একজন এমন ভোক্তা নিশ্চয় আছেন যিনি এই ত্রিগুণকে অনুকূল এবং প্রতিকূল বলে ভোগ করেন। কারিকার এই যুক্তিটির আকার 'ভোক্তৃ-

ভাবাৎ'। অনেকে আবার বলেন যে এখানে ভোগ্য মানে দৃশ্য এবং ভোক্তা মানে দ্রষ্টা। যেহেতু মহদাদিক্রমে ব্যক্ত প্রকৃতি দৃশ্য এর একজন প্রকৃতির অতীত দ্রষ্টা নিশ্চয় আছে—নচেৎ একে দৃশ্য বলে ভাবা যাবে কেমন করে? প্রকৃতি যে দৃশ্য তা তো বোঝাই যায় কেন না প্রাকৃতিক বস্তুনিচয় সুখ দুঃখ ও মোহাত্মক।

সর্বশেষ যুক্তি হ'ল যে কোনও কোনও মুমুক্ষুর কৈবল্যের প্রতি প্রবৃত্তি দেখা যায়। শাস্ত্রে মহাপুরুষ ও দিব্যজ্ঞানীদের দ্বারা এই কৈবল্য স্বীকৃত হয়েছে। কৈবল্য হচ্ছে দুঃখের আত্যন্তিক প্রশমন। দুঃখ প্রকৃতির তিনটি অবয়বের অন্যতম। সুতরাং প্রকৃতিতে কখনোই দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ হতে পারে না। প্রকৃতি হতে সম্পূর্ণ বিবিক্ত হ'লে তবেই কৈবল্য সম্ভব। অতএব বুদ্ধ্যাদি হতে ভিন্ন আত্মাই এই কৈবল্যার্থে প্রবৃত্তি হতে সিদ্ধ হয়।

পুরুষবহুত্ব

এখন প্রশ্ন হ'ল—সাংখ্যসিদ্ধান্তে প্রকৃতি তো এক—পুরুষও কি এক? সাংখ্যের পুরুষ যদিও উদাসীন, নির্লেপ, নিষ্ক্রিয় শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ তবুও সাংখ্যকার সর্বগ্রাসী এক আত্মা না মেনে বহুপুরুষবাদ স্থাপন করেছেন। পুরুষে পুরুষে ভেদক বলতে কাকে স্বীকার করা হবে এই প্রশ্নের উত্তরে ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর সাংখ্যকারিকায় বলেছেন—

জনমমরণকরণানাং প্রতিনিয়মাদযুগপতপ্রবৃত্তেশ্চ।
পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্যবিপর্যয়াচ্চৈব ॥ ১৮ ॥

অর্থাৎ (ক) জন্ম মরণ এবং করণ (ইন্দ্রিয়)গুলির ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ব্যবস্থা আছে। (খ) বিভিন্ন পুরুষের প্রবৃত্তিগুলি যুগপৎ হয় না। (গ) ব্যক্তিভেদে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণের আনুপাতিক ভেদ হয়। এই তিন হেতুই পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধ করে।

প্রথম যুক্তি হ'ল জন্ম, মরণ এবং করণ প্রতিব্যক্তিতে নিয়ত বা ব্যবস্থিত। একজনের জন্ম বা মৃত্যু বা ইন্দ্রিয়াদি অন্যের জন্ম বা মৃত্যু বা ইন্দ্রিয়াদি নয়। প্রতিটি পুরুষেরই ভিন্ন জন্ম, মৃত্যু ও ইন্দ্রিয়। পুরুষের জন্ম বা মৃত্যু বলতে সাংখ্যে কি বোঝায়? পুরুষ বা আত্মা তো অপরিণামী, নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার, চিৎস্বরূপ। এমন কি মন বা বুদ্ধিও আত্মা নয়। মন স্থিরভাবে আপনাকে দর্শন করলেই উপলব্ধি করে 'আমি আত্মার অধীন—আমার মধ্যে সংশয় বা নিশ্চয় যা কিছু হচ্ছে আত্মা তার নির্বিকার দ্রষ্টা। লোক-ব্যবহারেও সর্বদাই

শুনি—'আমার মন'। 'আমি মন' কেউই বলে না। সুতরাং এই নির্বিকার আত্মা সম্পর্কে যখন বলি 'আমি জন্মালাম' বা 'আমি মরলাম' তখন ঐসব বাক্যের পারিভাষিক, লাক্ষণিক প্রয়োগমাত্র হয়েছে বুঝতে হবে। সাংখ্যকার বলেন নূতন দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারের সঙ্গে অপূর্ব সংযোগ হ'লে আমরা বলি পুরুষ বা আত্মার জন্ম হ'ল। আবার ঐ সংযোগ নাশ হ'লে বলি পুরুষের মৃত্যু হ'ল। পুরুষের এতে সৃষ্টি বা বিনাশ কোনোটাই সূচিত হয় না। করণ বলতে সাধারণত আমরা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও মন এই একাদশকে বুঝি। কিন্তু কারিকাকার মহৎ বা বুদ্ধি এবং অহঙ্কারকেও করণের অন্তর্গত করে করণসংখ্যা ত্রয়োদশ বলেছেন। এই ত্রয়োদশের এক একটি গুচ্ছের সঙ্গে এক একজন ভিন্ন পুরুষের সংযোগ বিয়োগাদি ঘটে। নচেৎ সকল পুরুষই এক দেহাদি প্রাপ্ত হ'ত এবং একই সময়ে জন্মাত, মরত, অন্ধ বা বধির হ'ত বা হ'ত না। বেদান্তে যেমন বলা হয়েছে যে এক অদ্বৈত শুদ্ধ চৈতন্য বহু অন্তঃকরণরূপ উপাধির দ্বারা উপহিত হন—সুতরাং জীব বহু হলেও ব্রহ্ম এক—সাংখ্যে সে কথা মানা হয় না। সাংখ্যাচার্যগণ বলেন যে এক আত্মা যদি অন্তঃকরণভেদে বহুরূপে প্রতিভাত হয় তবে এক আত্মাই হস্তপদাদিভেদে বহুরূপে প্রতিভাত হবে না কেন? সেক্ষেত্রে দৈবাৎ হাতটি কেটে গেলে কি ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলি?

দ্বিতীয় যুক্তি হ'ল যে সকল মানুষের একই সময়ে একই প্রবৃত্তি হয় না। এখন প্রশ্ন ওঠে 'প্রবৃত্তি' তো অন্তঃকরণের ধর্ম। পুরুষে এই ধর্মের উপচার বা আরোপ হয় মাত্র। পুরুষ তো এই ধর্ম বিশিষ্ট হতে পারে না। যাই হোক্ আরোপিত হলেও আমরা তো "পুরুষ নানাপ্রকার নড়াচড়া করে" এইরূপ ব্যবহার করি। যদি পুরুষ বহু না হয়ে এক হ'ত তাহলে তো সকলে একসঙ্গে একইভাবে নড়ত। কিন্তু তা তো হয় না। কাজেই স্বীকার করতে হবে যে পুরুষ বহু।

অন্তিম যুক্তি হ'ল যে সত্ত্ব রজঃ তমোগুণের আনুপাতিক তারতম্যও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভেদ সিদ্ধ করে। দেবতা ও সাধুদের মধ্যে সত্ত্বগুণের আধিক্য দেখা যায়, মানুষে রজোগুণের এবং ইতর প্রাণীর মধ্যে তমোগুণের বাহুল্য আছে। যদি পুরুষ বা আত্মা একই হ'ত তবে দৃশ্য দেহগুলির বৈচিত্র্যের কী ব্যাখ্যা আমরা করতে পারতাম? সুতরাং স্বীকার করতে হবে যে পুরুষ বহু।

উপরে ব্যাখ্যাত বহুপুরুষবাদ যে সম্পূর্ণ শ্রুতিবিরোধী সিদ্ধান্ত শঙ্কর সে বিষয়ে দৃঢ়মত ব্যক্ত করেছেন। আত্মন্ এবং ব্রহ্মন্ যে এক—জীব যে অন্তঃকরণোপহিত শুদ্ধচৈতন্যই শঙ্কর বারবার সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। বেদান্তমতে জীবে জীবে যে ভেদ অনুভূত হয় সে কেবল অন্তঃকরণগুলি ভিন্ন বলেই। কিন্তু নির্বিশেষ শুদ্ধচৈতন্যের বিশেষণ তো এই অন্তঃকরণ হতে পারে না। প্রতিটি অন্তঃকরণের সঙ্গে যে সাক্ষীচৈতন্য সংলগ্ন আছে সেইটিই শুদ্ধ আত্মা। অন্তঃকরণরূপ উপাধির বিলোপ ঘটলে সেই শুদ্ধআত্মা ব্রহ্মরূপে বিরাজ করে। এই শুদ্ধচৈতন্যের কোনও ভেদক না থাকায় এ বহু হতেই পারে না। বেদান্ত সিদ্ধান্ত যদি নাও মানি তবু একথা স্বীকার করতেই হবে যে সাংখ্যকারিকায় পুরুষ বহুত্বের সপক্ষে যে যুক্তিগুলি দেওয়া হয়েছে আপাতদৃষ্টিতে সেগুলি গ্রাহ্য বলে মনে হয় না। প্রকৃতির রাজ্যের ভেদক দিয়ে পুরুষে ভেদ স্থাপন করা তো অসম্ভব বলেই মনে হয়। জন্ম, মৃত্যু, করণ, প্রবৃত্তি, ত্রৈগুণ্য এ সবই তো প্রকৃতির রাজ্যেরই ব্যাপার। অতএব মনে হতে পারে যে কারিকাকার যুক্তি দিয়ে জীববহুত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন—পুরুষবহুত্ব নয়। কিন্তু এত সহজেই যে যুক্তিকে উড়িয়ে দেওয়া যায় সাংখ্যাচার্যগণ সেইগুলিই উপস্থাপিত করবেন এ কথনোই হতে পারে না। একটু অনুধাবন করলেই তাঁদের যুক্তির অন্তর্নিহিত তাৎপর্যটি আমাদের কাছে পরিস্ফুট হবে। সাংখ্যসিদ্ধান্তে পুরুষকে বুদ্ধির প্রতিসংবেত্তারূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। পুরুষ যদিও অসঙ্গ নির্লেপ তথাপি সে সাক্ষী। কিসের সাক্ষী? প্রতিটি পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন জন্ম মৃত্যু ও প্রবৃত্তির সাক্ষী। অর্থাৎ কারিকাকার জন্ম মরণ প্রবৃত্ত্যাদির ব্যবস্থার কথা বলে তাদের প্রতিসংবেত্তাগুলির বহুত্বের পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন। এই পুরুষ নিজের নিকট স্ববোধে প্রত্যগাত্মা বা প্রত্যক্-চেতনরূপে উদ্ভাসিত। পুরুষ যখন এইভাবে স্ববোধে ভাসমান হয় তখন কিন্তু তার মধ্যে অপর কোনও পুরুষের বোধ থাকে না। অর্থাৎ 'আমিই অমুক' বা 'আমি ও সে একই' এই আকারে স্ববোধ কখনোই হয় না। সুতরাং বেদান্ত সিদ্ধান্তে সকল আত্মার যে একত্ব কল্পিত হয়েছে আমাদের অভিজ্ঞতায় (সাংখ্যকারগণ বলেন) তার সপক্ষে কিছুই পাই না। যদি তা সত্ত্বেও বৈদান্তিকগণ তাঁদের অদ্বৈতসিদ্ধান্ত স্থাপন করার প্রয়াস করেন তবে পরিপোষক যুক্তি বা অনুভবের দৃষ্টান্ত দেবার দায় তাঁদেরই, সাংখ্যাচার্যগণের নয়।

আরও বিবেচ্য এই যে বেতান্তসম্মত অদ্বৈত ব্রহ্ম বা শুদ্ধচৈতন্য নির্গুণ

নির্থর্মক। অথচ সাধর্ম্য বৈধর্ম্যের বিচার ছাড়া একত্ব বা অনেকত্বের বিচার অসম্ভব। অতএব বেদান্তশাস্ত্রে শুদ্ধচৈতন্যের একত্ব প্রতিষ্ঠার যে প্রয়াস দেখা যায় তা যুক্তিসঙ্গত নয়। এস্থলে আরও একটি বিষয় বিবেচনা করা উচিত। সর্বতোভাবে ধর্মগত সাদৃশ্য থাকলেই যে বস্তুগুলি সংখ্যাগণনায়ও এক হতে বাধ্য এমন কথা অযৌক্তিক। ধর্মের দিক থেকে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য থেকেও ধর্মীগুলি অনেক হতে পারে—যেমন সমান আকার আয়তন ও বর্ণবিশিষ্ট দুইটি বালুকণা।

সবশেষে মনে রাখতে হবে যে সাংখ্য মোক্ষশাস্ত্র। মোক্ষের সাধনাবস্থায় পুরুষবহুত্ব একটি অবশ্যস্বীকার্য সিদ্ধান্ত। কেন না কৈবল্যার্থ প্রবৃত্তিগুলির চেতন অধিষ্ঠাতারূপেই মুমুক্ষু পুরুষ সিদ্ধ হয়। আর এই পুরুষগুলি বহু কেন না মুমুক্ষা তো সকল পুরুষে যুগপৎ দৃষ্ট হয় না। কৈবল্যপ্রাপ্তির পর অবশ্য একত্ব বহুত্বের বিচার অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। এই কথাগুলি মনে রাখলে সাংখ্যের বহুপুরুষবাদের মর্মোদ্ঘাটন সহজসাধ্য হবে।

কৈবল্য

পুরুষ তো নির্বিকার দ্রষ্টা—তার বন্ধমোক্ষ হবে কেমন করে? সাংখ্যকার এই প্রশ্নের উত্তরে প্রসঙ্গত লিঙ্গশরীর বা সূক্ষ্মশরীরের কথা বলেছেন। আত্মা অকর্তা শুদ্ধচৈতন্য—তার তো গমনাগমন থাকতে পারে না। তবে কারই বা জন্ম হয় কারই বা মরণ হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে সাংখ্য বলেন যে দৃশ্যমান স্থূলশরীরের অভ্যন্তরে একটি সূক্ষ্ম বা লিঙ্গশরীর আছে। যতদিন না সেই শরীর প্রকৃতিতে প্রলীন হয় ততদিন বারবার সে ইহলোক পরলোকে গমনাগমন করে। অন্তঃকরণাদিদ্বারা রচিত শুদ্ধ জ্ঞানময় এই লিঙ্গশরীরের কোনও মূর্তি না থাকায় কেউ একে প্রত্যক্ষ করতে পারে না। তবে এই সূক্ষ্মশরীর যে আছে তার প্রমাণ কি? সাংখ্যকার বলেন যে যোগীপুরুষদের অনুভব ও তাঁদের অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপই এর প্রমাণ। ছায়া যেমন মূর্তপদার্থ ব্যতীত থাকতে পারে না এই সূক্ষ্মশরীরও স্থূলশরীরে আশ্রিত হয়েই থাকে এবং ঐ শরীরের সাহায্যেই তার কর্মজ্ঞানাদি উৎপন্ন হয় এবং তজ্জন্য সংস্কারও ঐ সূক্ষ্মশরীরেই স্থিতিলাভ করে। এক স্থূলশরীরের মৃত্যু ও অপর স্থূলশরীরের জন্মের মধ্যের সময়টিতে কর্মজন্য ধর্মাধর্মাদি সংস্কার ঐ সূক্ষ্মশরীরেই বিধৃত থাকে।

কিন্তু তবুও প্রশ্ন থেকে যায় পুরুষ নিত্য মুক্ত হয়েও আপনাকে বদ্ধ মনে করে কৈবল্যের জন্য চেষ্টা করে এ তো আমাদের সকলেরই অভিজ্ঞতা। আমরা কেউই ভাবি না যে, 'আমার সুখদুঃখাদি কিছুই নেই—আমি দ্রষ্টা মাত্র।' এর বিপরীত বুদ্ধি, অর্থাৎ 'আমি সুখী, আমি দুঃখী—আমি সংসারে বিপাকে পড়েছি' এই জ্ঞানই স্বাভাবিক। সাংখ্যকার এর কী উত্তর দেবেন? সাংখ্য-মতে আত্মা বা পুরুষ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত এই মতই যুক্তিযুক্ত—কেন না আত্মা যদি বদ্ধস্বভাব হত তবে শত চেষ্টাতেও তাকে মুক্ত করা যেত না। যার যা স্বভাব তাকে তা কখনও ত্যাগ করে না। বস্তু ও তার স্বভাব সমনিয়ত। তাছাড়াও নির্লিপ্ত অকর্তা দ্রষ্টার কর্মফল না থাকায় তার সুখদুঃখাদি ভোগের কোনও সম্ভাবনাই নেই। কিন্তু প্রকৃতির সত্ত্বপ্রধান বিকৃতি বুদ্ধিতে চৈতন্য-স্বরূপ পুরুষ প্রতিফলিত হওয়াতে অবিবেকহেতু আমরা প্রকৃতিকে অর্থাৎ বুদ্ধিকে চেতন বলে ভুল করি এবং পুরুষকে ঐ বুদ্ধির সঙ্গে এক বলে ভুল করে মনে করি যে প্রকৃতির সুখদুঃখাদি বুঝি আত্মাই ভোগ করছে। এই মূল অবিবেক যেদিন দূর হবে—অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষে বিবেকখ্যাতি হবে সেইদিনই কৈবল্য লাভ হবে। এই লাভ কিন্তু প্রাপ্তপ্রাপ্তি—নূতন কোনও অর্থের প্রাপ্তি নয়। শরীরসত্ত্বেও এই বিবেকখ্যাতি সম্ভব—কিন্তু দেহ আপনার নিয়মে তার আয়ুষ্কাল পূর্ণ করে সম্পূর্ণ ক্ষয়প্রাপ্ত হলে তবেই পূর্ণমুক্তি হবে—অর্থাৎ ঐ বিবেকবান্ পুরুষের আর প্রকৃতিসংযোগ হবে না। মহর্ষি কপিল তাঁর গ্রন্থশেষে সেই কথাই বলেছেন—তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ—অর্থাৎ প্রাকৃতিক সম্বন্ধের উচ্ছেদ হওয়াই পরমপুরুষার্থ। এই জড়সম্বন্ধরহিত কেবল অবস্থায় আত্মা কেমন থাকে তা বচনাতীত—কেন না সংসারে তো এর কোনও দৃষ্টান্ত থাকতে পারে না। তবে সুষুপ্তি বা নিঃস্বপ্ন নিদ্রায় জীব যেমন সুখদুঃখ-মুক্ত হয়, বলা যায় যে মুক্ত অবস্থাতেও সে তেমনই কেবলীভাব প্রাপ্ত হয়। কেবল প্রভেদ এই যে সুষুপ্তিকালে আত্মা তমসাচ্ছন্ন থাকে, মুক্ত হলে আর সে আবরণ থাকে না। আরও প্রভেদ এই যে সুষুপ্তি হতে উত্থান হয় এবং উত্থান হ'লে পুনরায় সুখদুঃখভোগ হয়। কিন্তু মুক্তি এলে আর পূর্বাবস্থা ফিরে আসে না। এই মুক্ত বা কেবল অবস্থা একরূপ এবং গুণাতীত। এইজন্য বেদান্তে যে ব্রহ্মানন্দের উল্লেখ দেখা যায় সাংখ্য তা স্বীকার করেন না।

এই বিবেকখ্যাতিলাভের উপায় অভ্যাস ও বৈরাগ্য। পাতঞ্জল দর্শনের বিস্তৃত আলোচনার সময় এ বিষয়ে আরও বলা হবে।

ঈশ্বর

সাংখ্যকার কপিল যে নিরীশ্বরবাদী ছিলেন একমাত্র বিজ্ঞানভিক্ষু ব্যতীত প্রাচীন ও অর্বাচীন আর সকল পণ্ডিতই তা স্বীকার করেন। মহাভারত, ভাগবত, পুরাণাদিতে কপিলকে প্রায় ঈশ্বরের প্রধান ভক্ত বা অবতাররূপে চিত্রিত করার প্রচেষ্টা হয়েছে বটে তবে একথা সব সময়েই স্মরণ রাখতে হবে যে মহাভারত পুরাণাদিতে যা বলা হয়েছে তা লোকশিক্ষার্থে সাধারণগ্রাহ্য-ভাবেই বলা হয়েছে। কোনও সিদ্ধান্তের স্বরূপ তাতে বিম্বিত হলেও গ্রন্থকার বিচলিত হন্‌নি। বিজ্ঞানভিক্ষুর ব্যাখ্যা যে অপব্যাখ্যা তা আমরা সাংখ্য-সূত্রের বিস্তারিত আলোচনাকালেই দেখাবার চেষ্টা করবো। আগেই বলা হয়েছে যে সাংখ্যসূত্র, সাংখ্যকারিকা, তত্ত্বকৌমুদী ও গৌড়পাদভাষ্য এইগুলিই সাংখ্যের সুপ্রাপ্য ও প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে সমাদৃত। সাংখ্যসূত্র যদিও অর্বাচীন (খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত) তবুও সূত্রকার সাংখ্যের নিরীশ্বরবাদী রূপটি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। সূত্রগ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে চারটি, তৃতীয় অধ্যায়ে একটি এবং পঞ্চম অধ্যায়ে এগারটি সূত্রে কপিল নিরীশ্বরবাদের সপক্ষে যুক্তিগুলি গ্রথিত করেছেন। ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর কারিকাকে 'পরবাদবিবর্জিত' অর্থাৎ বাদানু-বাদমুক্ত রাখতে চেয়েছিলেন। সম্ভবত সেইজন্যই মুখ্যতঃ কোথাও ঈশ্বর-প্রসঙ্গ উত্থাপন করেননি। কেবল বাচস্পতি তাঁর তত্ত্বকৌমুদী টীকায় সাতান্ন সংখ্যক কারিকার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঈশ্বরকর্তৃত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। গৌড়পাদ আরও পরে বাষট্টি সংখ্যক কারিকার ব্যাখ্যাসূত্রে ঈশ্বরপ্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। মনে রাখা উচিত যে এঁদের দুজনের মধ্যে কেউই সাংখ্যসিদ্ধান্তের অর্থাৎ নিরীশ্বরবাদের পোষক ছিলেন না। তাঁরাও কিন্তু যুক্তিজাল বিস্তার করে নিরীশ্বরবাদই সাংখ্যের সিদ্ধান্ত এই মত প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছেন। এ থেকে মনে হয় যে সাংখ্য যে নিরীশ্বরবাদী দর্শন এ বিষয়ে একটি চিরাগত ঐতিহ্য ছিল। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ঋষি তাই বিশেষ করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন যে সাংখ্যের প্রতিপাদ্য প্রধান বা প্রকৃতি অনিত্য—ঈশ্বরই নিত্য। এ বিষয়ে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। প্রফেসর জিমার তো এমনও বলেন যে সাংখ্য কোনও প্রাগার্য অতি প্রাচীন স্বভাববাদী দর্শন। পরবর্তীকালে উপনিষদ এবং মহাকাব্যে একে শ্রদ্ধার সঙ্গে বিবেচনা করে কিছু গ্রহণ কিছু বর্জন করে ব্রহ্মবাদের মূল ধারার সঙ্গে মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

ভারতীয় ঈশ্বরবাদীরা সাধারণত ঈশ্বরের সত্তা সিদ্ধ করার জন্য এই যুক্তিগুলি দেন—(ক) কোনও সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ স্রষ্টার কল্পনা না করে এই জগৎসৃষ্টির ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। (খ) পাপপুণ্যের ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী অথচ পাপপুণ্যজনিত ধর্মাধর্মরূপ 'অদৃষ্ট' জড়বস্তু হওয়াতে চেতন নিয়ন্তার অভাবে সে যথাযথভাবে সুখদুঃখাদির ব্যবস্থা করতে পারে না। অতএব একজন চেতন নিয়ন্তার অধীন হয়েই অদৃষ্ট কাজ করে এটাই সত্য। (গ) শাস্ত্রে এবং লোকব্যবহারেও উপাস্য ঈশ্বরের উল্লেখ পাই।

সাংখ্যশাস্ত্রে শুধু যে নিরীশ্বরবাদ স্থাপন করা হয়েছে তাই নয়, পরন্তু উপরের যুক্তিগুলিকে বিশেষভাবে খণ্ডনও করা হয়েছে। আমরা প্রথমে সাংখ্যসূত্রে নিরীশ্বরবাদ স্থাপন করবার জন্য যে যুক্তিগুলি দেওয়া হয়েছে সেগুলির বিবেচনা করবো।

সাংখ্যসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের বিরানব্বই সংখ্যক সূত্র হ'ল 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ'। এই সূত্রটি প্রত্যক্ষের লক্ষণের বিরুদ্ধে উত্থাপিত একটি আপত্তির উত্তর হিসাবে দেওয়া হয়েছে। সূত্রকার প্রত্যক্ষের লক্ষণ দিয়েছিলেন 'ইন্দ্রিয় এবং অর্থের সন্নিকর্ষজন্যজ্ঞান'। এর বিরুদ্ধে আপত্তি উঠল যে ঈশ্বরের তো ইন্দ্রিয় নেই—তাহলে এই লক্ষণ ঈশ্বরপ্রত্যক্ষে অব্যাপ্ত হ'ল। উত্তরে সূত্রকার বললেন যে ঈশ্বরপ্রত্যক্ষের কথাই ওঠে না কেন না স্বয়ং ঈশ্বরই অসিদ্ধ। বিজ্ঞানভিক্ষু এখানে বলবার চেষ্টা করেছেন যে সূত্রকারের যদি ঈশ্বরের অভাব সিদ্ধ করার ইচ্ছা থাকত তবে তিনি 'যেহেতু ঈশ্বর অসিদ্ধ' না বলে বলতেন 'যেহেতু ঈশ্বরের অভাব আছে'। অর্থাৎ বিজ্ঞানভিক্ষু বলছেন যে কপিল 'ঈশ্বর নাই' একথা বলেন নি—শুধু ঈশ্বরকে সিদ্ধ করা যায় না এইটুকুই বলেছেন। কিন্তু বিজ্ঞানভিক্ষুর ব্যাখ্যাই যদি ঠিক হয় তবে ঠিক তার পরের তিনটি সূত্রও কেন ঈশ্বরের সপক্ষে আনীত যুক্তিগুলির খণ্ডন হিসাবে উপস্থাপিত হবে! ৯৩ ও ৯৪ সংখ্যক সূত্রে কপিল বলছেন—'মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন-তৎসিদ্ধিঃ। উভয়াপ্যসৎকরত্বম্'। অর্থাৎ পুরুষ বা আত্মা হয় মুক্ত নয় বদ্ধ। এ ভিন্ন সে তৃতীয় আর কিছু হতে পারে না। ঈশ্বর মুক্ত নন্ কেন না মুক্ত-পুরুষের ইচ্ছা ও যত্ন, প্রবৃত্তি অভিমানাদি নাই। এবং এ সকল না থাকলে সৃষ্টিকার্য অসম্ভব। তবে কি তাঁকে বদ্ধ বলবো? বদ্ধপুরুষ তো অবিবেক দ্বারা মুগ্ধ। তিনি কি করে জগতের সর্বজ্ঞ স্রষ্টা হবেন? তবে যে শাস্ত্রে এবং লোকব্যবহারে এত ঈশ্বরের উল্লেখ পাওয়া :যায়? উত্তরে ৯৫ সংখ্যক

সূত্রে কপিল বললেন যে মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাসাসিদ্ধস্য বা। অর্থাৎ শাস্ত্রে বা লোকব্যবহারে উপাসনা ও প্রশংসার্থে মুক্তাত্মাদের ঈশ্বর বলে অভিহিত করা হয়। 'ঈশ্বর' শব্দটির এই পারিভাষিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে সাংখ্যকারের কোনও আপত্তি নাই। তৃতীয় অধ্যায়ে সূত্রকার এই কথাটিরই পুনরাবৃত্তি করেছেন। পঞ্চম অধ্যায়ে এগারটি সূত্রে ঈশ্বরনিষেধ করা হয়েছে। প্রথমত কর্মফল বা অদৃষ্ট ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণেই ফলপ্রসূ হ'তে পারে বলে ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে যে মত প্রকাশ করা হয় তার উত্তরে সূত্রকার বলেন যে কর্ম নিজ স্বভাবেই ফলপ্রসব করে। এর জন্য ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্ব কল্পনা করার কোনও প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ সাংখ্য এখানে স্বভাববাদী। সূত্রকার আরও বলেন যে রাজা ইত্যাদি যত লৌকিক অধিষ্ঠাতা আছেন তাঁরা সকলেই নিজের নিজের উপকারের জন্য অর্থাৎ স্বার্থসিদ্ধির জন্যই কর্ম করেন। তবে কি স্বীকার করবো যে ঈশ্বরও নিজের উপকারার্থই জগৎসৃজন করেন? তবে তো তিনি লৌকিক রাজাদের মত স্বার্থপর সংসারী এবং সুখদুঃখভাগী হয়ে পড়েন। ঐ রকম সাংসারিক জীবের প্রতি একমাত্র পারিভাষিক অর্থেই ঈশ্বরশব্দের প্রয়োগ হতে পারে। আরও বিবেচনা করুন রাগবশতই প্রবৃত্তি ও দ্বেষবশতই নিবৃত্তি এ তো আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতাতেই জানি। ঈশ্বরের যদি জগৎসৃষ্টিতে প্রবৃত্তি দেখা যায় তবে স্বীকার করতে হবে যে তিনি রাগদ্বেষবিনির্মুক্ত নিত্যমুক্ত পুরুষ নন্। প্রকৃতিতে যে রাগদ্বেষ ইচ্ছা অনিচ্ছা সুখদুঃখাদি আছে ঈশ্বরকে সেই সবের সম্বন্ধাধীন করলে তাঁর অসঙ্গ চৈতন্য-স্বরূপ স্বভাবের হানি হবে। প্রকৃতির সঙ্গে সন্নিধান থাকলেও যদি ঈশ্বর হওয়া যায় তবে সকল বদ্ধপুরুষকেই বা ঈশ্বর বলি না কেন? সবশেষে মনে রাখতে হবে যে ঈশ্বরসাধক কোনও প্রমাণ নেই। সাংখ্যশাস্ত্রে তিনটি প্রমাণ স্বীকৃত—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শ্রুতি। ঈশ্বর প্রত্যক্ষপ্রমাণের অগোচর। অনুমানপ্রমাণ ব্যাপ্তিজ্ঞাননির্ভর। যদি ঈশ্বরসিদ্ধির জন্য অনুমানপ্রমাণ প্রয়োগ করতে হয় তাহলে একটি হেতুকে এবং সেই হেতুটির সঙ্গে ঈশ্বররূপ সাধ্যের ব্যাপ্তিসম্বন্ধকে জানতে হবে। ঈশ্বরকে যেহেতু প্রত্যক্ষ করা যায় না সেইজন্য ঈশ্বররূপ সাধ্যের সঙ্গে কোনও হেতুর অব্যভিচারী সহচারের জ্ঞান অসম্ভব। অতএব ব্যাপ্তিজ্ঞানের অভাবে ঈশ্বরকে অনুমানপ্রমাণের সাহায্যেও জানা যাবে না। আর শ্রুতিপ্রমাণে তো প্রকৃতি বা প্রধান যে কর্ত্রী তা স্বীকারই করা হয়েছে। (বিশেষ দ্রষ্টব্য যে সাংখ্যসূত্রকার শ্রুতিকে অস্বীকার

না করে নিজ মতের পক্ষে শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করছেন)। এতকথা বলার পরও কি আরও প্রমাণের প্রয়োজন যে কপিলের অন্তরে ঈশ্বরভাব ছিল না। তিনি শুধু ঈশ্বর সিদ্ধ নন্ বলেই ক্ষান্ত হন্ নি—ঈশ্বর নাইও বলেছেন।

সাংখ্যকারিকার ৫৭ সংখ্যক কারিকায় টীকা লিখতে গিয়ে তত্ত্বকৌমুদীকার বাচস্পতি মিশ্র বলেছেন যে পুরুষের কৈবল্যের জন্য প্রকৃতি যে অভিব্যক্ত হয় বা নিজেকে নর্তকীর মত দর্শন করায় তার ব্যাখ্যা করার জন্য নিয়ন্তা ঈশ্বরের কল্পনার কোনও প্রয়োজন নেই। বরং ঈশ্বরকে নিয়ন্তা হিসাবে কল্পনা ক'রলে আপত্তি উঠবে যে কর্তা সর্বদাই স্বার্থসিদ্ধির জন্য বা দয়াপরবশ হয়েই কার্য করেন। ঈশ্বর তো আপ্তকাম। তাঁর সকল স্বার্থ সিদ্ধ হয়েই আছে। তাঁর আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য কর্ম করা নিষ্প্রয়োজন। আর সৃষ্টির পূর্বে জীব থাকে না—অতএব জীবের দুঃখও থাকে না। তবে ঈশ্বর কার প্রতি দয়াবশত সৃষ্টিকর্মে লিপ্ত হবেন? আরও বিবেচনা করুন—দয়াপরবশ হয়েই যদি ঈশ্বর জগৎসৃষ্টি করতেন তবে তো সুখময় জগৎই সৃষ্ট হত। সে জগতে দুঃখ আদৌ থাকত কেন? সুখদুঃখভোগের তারতম্য ব্যাখ্যার জন্য কর্ম এবং কর্মফলই যথেষ্ট। ঈশ্বরকল্পনায় চিন্তার অসঙ্গতি বেড়ে যায় মাত্র।

গৌড়পাদ তাঁর ভাষ্যে অপর একটি ঈশ্বরনিষেধক যুক্তি দিয়েছেন। তিনি বলেন যে জগতের কারণ হিসাবে সাংখ্য প্রকৃতিকেই নির্দিষ্ট করেছেন। কিন্তু কেউ কেউ ঈশ্বর বা পুরুষ বা কালকে জগতের কারণ বলে মনে করেন। গৌড়পাদ বলেন প্রকৃতি ত্রিগুণা, পুরুষ বা ঈশ্বর নির্গুণ। কার্য এবং কারণের স্বভাব একইরকম হয় এই নিয়ম। সুতরাং জগতের কারণ ঈশ্বর বা পুরুষ হতে পারেন না। কেন না ব্যক্ত জগৎসংসার ত্রিগুণাত্মক এবং জড়। অতএব প্রকৃতিই জগৎকারণ, ঈশ্বর নন্। অর্থাৎ গৌড়পাদ এখানে ঈশ্বরকে জগতের উপাদান কারণ হিসাবে কল্পনা করার অযৌক্তিকতা দেখিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে কাপড়ের উপাদানকারণ সুতা একথা স্বীকার করলেও নিমিত্ত-কারণরূপে আমরা তন্তুবায়কে স্বীকার করি। সেইরকম জগতের উপাদান-কারণ প্রকৃতি একথা স্বীকার করলেও নিমিত্তকারণরূপে ঈশ্বরস্বীকারে বাধা কোথায়? এর উত্তর গৌড়পাদ না দিলেও বাচস্পতি দিয়েছেন এবং তাঁর উত্তরগুলি আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। এইসূত্রে মহাকালকে জগতের জনকরূপে অস্বীকার করে গৌড়পাদ যে যুক্তি দিয়েছেন তা এই প্রসঙ্গেই আলোচনা করা উচিত। কেন না ঈশ্বরনিষেধ নঞর্থকমাত্র। তার সদর্থক-

দিকটি হচ্ছে প্রকৃতিকারণবাদ। প্রকৃতিকারণবাদের পূর্বপক্ষ হিসাবে মহাকালের জগৎকর্তৃত্ব নিষিদ্ধ হওয়া সাংখ্যসিদ্ধান্তস্থাপনের জন্য প্রয়োজন। গৌড়পাদের এক্ষেত্রে যুক্তি হ'ল কাল তো ব্যক্ত প্রকৃতির[৮] অন্তর্ভুক্ত। কাল কী করে প্রকৃতির কারণ হতে পারে ?

উপরের যুক্তিগুলি অনুধাবন করলে বোঝা যায় যে সাংখ্যকার সেই প্রাচীন যুগেই লৌকিক কার্যের ব্যাখ্যায় অলৌকিক কারণ কল্পনা করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেননি। এইখানে সাংখ্যের সঙ্গে বৌদ্ধমতের এবং চিকিৎসাশাস্ত্রের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। বুদ্ধ যেমন দুঃখের সমুদায় সন্ধান করতে গিয়ে লৌকিক দ্বাদশ নিদানের সাক্ষাৎজ্ঞান লাভ করেছিলেন, ভিষক্ যেমন রোগের কারণ হিসাবে লৌকিক কিছুকেই নির্দেশ করেন সাংখ্যকারও তেমনই সংসাররোগ ও তার কারণ হিসাবে ত্রিগুণা প্রকৃতির বাইরে আর কোথাও খুঁজতে যাননি। জড়া প্রকৃতির আপাতদৃষ্টিতে উদ্দেশ্যমূলক ও নিয়ত আচরণও তিনি স্বভাববলেই হয় বলে ব্যাখ্যা করেছেন—অতিপ্রাকৃত সর্বজ্ঞ নিয়ন্তার কথা তুলে আরও কতকগুলি সমস্যার সৃষ্টি করেননি।

সাংখ্যই বোধহয় জগতের মধ্যে প্রাচীনতম দর্শনচিন্তা যাতে ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে জগতের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সাংখ্যের নিরীশ্বরবাদ বহুবিধ চিরাগত অবৈজ্ঞানিক মতের সঙ্গে সামাজিকভাবে সহাবস্থান করে এবং কালক্রমে তার তেজ কমে যায় এবং সাধারণলোকের মনে এ মতের প্রভাব এখন আর কিছুই নেই বললেও চলে।

সাংখ্যমতে জ্ঞানের লক্ষণ ও সাংখ্যসম্মত প্রমাণাবলী

সাংখ্য দ্বিতত্ত্ববাদী। শুদ্ধ চৈতন্য এবং অচেতন অমূল প্রধান উভয়ই সাংখ্যসিদ্ধান্তে নিত্যতত্ত্বরূপে স্বীকৃত। বিষয় এবং বিষয়ী জ্ঞানের এই দুই অঙ্গকেই সাংখ্য স্বীকার করেছেন। অবশ্য সাংখ্যমতে জ্ঞান বা বুদ্ধি প্রকৃতির সাত্ত্বিক বিকার এবং প্রকৃতি অচেতন বলেই বুদ্ধি বা জ্ঞানও অচেতন জড়বস্তু। অথচ আমাদের অন্যরকমই মনে হয়। যে কোনও জড়বস্তু হতে জ্ঞানের পার্থক্য আমাদের কাছে স্পষ্ট। সাংখ্যে এর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে যে প্রকৃতির সত্ত্ব নামক গুণটি স্বচ্ছ, লঘু এবং প্রকাশক। পুরুষসন্নিধানবশত গুণবিক্ষোভের ফলে প্রকৃতিতে যখন পরিণাম দেখা দেয় তখন প্রথমত সত্ত্বগুণ অন্য গুণ দুটিকে অভিভূত করে অবশ্য রজোগুণের সহায়তায় তার মধ্যে চলমানতাও আসে।

এই সত্ত্বগুণের প্রাধান্যহেতু প্রকৃতির প্রথম বিকৃতি বুদ্ধিকে চেতন বলে ভ্রম হয় কেন না বুদ্ধিতে পুরুষ বা শুদ্ধচৈতন্য প্রতিফলিত হয়। বুদ্ধি যখন মন ও অহঙ্কার সহিত ইন্দ্রিয়পথে নির্গত হয়ে বিষয়গুলির আকারে আকারিত হয় তখন সেই বুদ্ধিবৃত্তি বা অন্তঃকরণবৃত্তি বা চিত্তবৃত্তি পুরুষে পুনঃপ্রতিফলিত হয়ে "আমি জানছি—আমি করছি" এইরূপ অবিবেকী অভিমানের উৎপত্তি হয়। অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ে মিলিত হয়েই জ্ঞান উৎপন্ন করে—যদিও পুরুষে যে কর্তৃত্ব আরোপিত হয় সেটি তাত্ত্বিক নয়। অর্থাৎ পুরুষ বা শুদ্ধচৈতন্যের আলোকে আলোকিত না হওয়া পর্যন্ত জড় অন্তঃকরণবৃত্তিকে জ্ঞান বলা যেতে পারে না। অথচ পুরুষ অকর্তা—সুতরাং অন্তঃকরণের বৃত্তি বা বিষয়াকারে আকারিত হওয়া না হলে চৈতন্যের আলোকে উদ্ভাসিত হওয়ারও কিছু থাকে না। এই কটি কথা স্মরণে রাখলে সাংখ্যের জ্ঞানবিষয়ক মতবাদ বুঝতে সুবিধা হবে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেও বলা হয় যে বিষয়সান্নিধ্যে মানুষের ইন্দ্রিয়-মধ্যস্থ স্নায়ুগুলিতে চলমান বিদ্যুত্তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। কিন্তু ঐ বিদ্যুৎতরঙ্গই জ্ঞান নয়। জ্ঞানে যে চেতনভাবটি আছে তার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা বোধহয় মানব-দেহের স্নায়ুমণ্ডলীর বিশেষ বিশেষ পরিণাম দিয়েই করা যায় না। সেই পরিণাম যেহেতু জড়বস্তুর পরিণাম স্বভাবতই তা অচেতন। চৈতন্যের ব্যাখ্যার জন্য আরও কিছুর প্রয়োজন। সাংখ্যকার সেইটিকেই পুরুষ বা শুদ্ধচৈতন্য বলেছেন। তার আলোতেই চিত্তবৃত্তি আলোকিত বা চেতনায়মান হয়ে ওঠে।

ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখায় এই জ্ঞানের করণ বা প্রমাণ হিসাবে কয়েকটি নাম উল্লিখিত হয়েছে। চার্বাকরা একমাত্র প্রত্যক্ষকেই প্রমাণ বলে স্বীকার করেন। বৌদ্ধগণ প্রত্যক্ষ ছাড়াও অনুমানকেও প্রমাণ বলে মেনেছেন। বৈশেষিকগণও এই দুটি প্রমাণই স্বীকার করেন। নৈয়ায়িকরা চারটি প্রমাণ মেনেছেন—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ। প্রাভাকর মীমাংসকরা এই চারটির সঙ্গে অর্থাপত্তিকেও যোগ করেছেন। ভাট্ট ও বৈদান্তিকগণ এই পাঁচটির উপরেও অনুপলব্ধিকে একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ বলে স্বীকার করেছেন। সাংখ্যমতাবলম্বীগণ বলেন যে যেহেতু সংসারে নানা বস্তু আছে—এই সেইসকল বস্তুর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই ত্রৈকালিক অবস্থাভেদ আছে সেইজন্য একাধিক প্রমাণ অবশ্যস্বীকার্য। সাংখ্যশাস্ত্রে তিনটি প্রমাণ স্বীকৃত হয়েছে—দৃষ্ট (অর্থাৎ প্রত্যক্ষ), অনুমান ও আপ্তবচন অর্থাৎ শব্দ।

অন্য প্রমাণগুলি এঁদের মতে এই তিনটিরই অন্তর্ভুক্ত—যেমন উপমানকে তাঁরা প্রত্যক্ষের অন্তর্ভুক্ত করেন। যোগী ও ঋষিদের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে আলোচনা সর্বসাধারণের কোনও প্রয়োজন সাধন করবে না বলে সে সম্বন্ধে আর বিশেষ কোনও উল্লেখ সাংখ্যকার করেননি। ঈশ্বরকৃষ্ণ এ কথাটিও পরিষ্কার করে বলেছেন যে প্রমেয়গুলি নিয়েই তিনি মুখ্যতঃ আলোচনা করবেন। তবে প্রমেয়গুলি তো প্রমাণ দ্বারাই সিদ্ধ হয়। অতএব প্রমাণেরও আলোচনা করতে হবে।

অতঃপর কারিকাকার দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষের লক্ষণ দিয়েছেন "প্রতিবিষয়াধ্যবসায়ঃ"—অর্থাৎ অর্থ বা বিষয়সন্নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়জন্য নিশ্চয় জ্ঞানই প্রত্যক্ষ। বুদ্ধির তমোগুণ বা আবরকভাবকে পরাস্ত করে প্রকাশক সত্ত্বগুণের সমুদ্রেককেই 'অধ্যবসায়' শব্দ দ্বারা সূচিত করা হয়। লক্ষণে অধ্যবসায় শব্দের ব্যবহার করে ঈশ্বরকৃষ্ণ সংশয়কে প্রত্যক্ষজ্ঞানের আওতা থেকে বাদ দিয়েছেন। 'বিষয়ে'র উল্লেখ করাতে ভ্রম বা বিপর্যয়ও লক্ষণের লক্ষ্য থাকল না—কেননা ভ্রমে ইন্দ্রিয় বিষয়সন্নিকৃষ্ট হয় না। আর 'প্রতি' শব্দটি ব্যবহার করাতে বোঝা গেল যে ইন্দ্রিয়টি বিষয়ের সঙ্গে সন্নিকৃষ্ট হলে তবেই আমরা প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করি। সুতরাং অনুমিতি বা স্মৃতি প্রত্যক্ষজ্ঞান হতে পারে না কেননা বিষয় সেখানে অবর্তমান থাকায় ইন্দ্রিয় তার সঙ্গে সন্নিকৃষ্ট হতে পারে না।

প্রত্যক্ষের উপর ভিত্তি করেই অনুমানপ্রমাণ গড়ে ওঠে। চার্বাকগণ অনুমানপ্রমাণের নিষেধক যে মত প্রচার করেছেন সাংখ্যাচার্যগণ মনে করেন যে তা অযৌক্তিক কেননা অপর পুরুষের অন্তরে যে সংশয় অজ্ঞতা ভ্রমাদি আছে—যার নাশকল্পেই চার্বাকগণ বাগাড়ম্বর করেন—সেইসব সংশয়াদি তো প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়। তবে চার্বাকদের সেগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান হয় কি করে? অন্যপুরুষের অন্তরের সংশয় নিশ্চয়ের জ্ঞান লাভ করতে হলে অনুমান প্রমাণেরই শরণ নিতে হবে। বস্তুত অতীন্দ্রিয় যত কিছু বস্তু আছে সবের জ্ঞানই অনুমাননির্ভর। তত্ত্বকৌমুদীতে এই অনুমানের লক্ষণ দেওয়া হয়েছে—'লিঙ্গলিঙ্গিপূর্বকম্'। লিঙ্গ শব্দের অর্থ হেতু (middle term) এবং লিঙ্গী শব্দের অর্থ হেতুবিশিষ্ট সাধ্য (major term as determined by the middle term)। অর্থাৎ সাধ্যব্যাপ্য হেতুর প্রত্যক্ষ হতে হেতুর ব্যাপক সাধ্যের জ্ঞান হওয়াকেই অনুমান বলে। ব্যাপ্য অপেক্ষাকৃত স্বল্পায়তন দেশ ও ব্যাপক অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন দেশ অধিকার করে। যেমন ধূম ও বহ্নির

ক্ষেত্রে ধূম ব্যাপ্য ও বহ্নি ব্যাপক। কেননা যেখানেই ধূম সেখানে বহ্নিকে থাকতেই হবে নচেৎ ধূম থাকতেই পারে না। অথচ বহ্নি আছে ধূম নাই এমন আমরা সকলেই দেখেছি—কামারশালায় তপ্ত লৌহপিণ্ডে বহ্নি আছে কিন্তু ধূম নাই। হেতু ধূমকে পর্বতে দেখলাম এবং ধূম যে ব্যাপ্য ও বহ্নি যে ব্যাপক তাদের সহচার দর্শন করে একথাও জানি। অর্থাৎ যেখানেই ধূম দেখেছি সেখানেই বহ্নিও দেখেছি। অতএব আজ যে ধূম প্রত্যক্ষ করছি তার থেকেই আমার অনুমিতি হচ্ছে যে যদিও বহ্নিটি প্রত্যক্ষের অগোচর হয়ে রয়েছে তবুও নিশ্চয় বহ্নি আছে। এই অনুমিতির তিনটি প্রকার সাংখ্যাচার্যগণ স্বীকার করেন—বীত, অবীত এবং সামান্যতোদৃষ্ট। অবশ্য বড় ভাগ দুইটি বীত এবং অবীত অর্থাৎ অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী। বীতের আবার দুই আকার হয়—পূর্ববৎ এবং সামান্যতোদৃষ্ট এবং অবীত হচ্ছে শেষবৎ।

'পূর্ববৎ' শব্দের 'পূর্ব' অংশটির অর্থ 'প্রসিদ্ধ'। পূর্ববৎ অনুমিতির বিষয় হচ্ছে এমন একটি 'সামান্য' যার 'বিশেষ' আমাব কাছে প্রসিদ্ধ বা জ্ঞাত। একটি দৃষ্টান্ত দিলে বুঝতে সুবিধা হবে। যেমন পর্বতে ধূম দেখে বহ্নিত্ব-সামান্যের একটি বিশেষ অর্থাৎ ঐ পর্বতের বহ্নির অনুমান করি। এই বহ্নিত্ব-সামান্যের ব্যক্তিবিশেষ অর্থাৎ একটি বহ্নি আমি আগেই পাকশালায় দেখেছি। অর্থাৎ এখানে একটি জ্ঞাত বা প্রসিদ্ধ সামান্যের বিশেষের জ্ঞান হ'ল। এইজন্যই এর নাম পূর্ববৎ।

বীত অনুমানের অপর প্রকার সামান্যতোদৃষ্ট। এখানে অনুমিতির বিষয় হচ্ছে এমন একটি 'সামান্য' যার 'বিশেষে'র জ্ঞান আমার হয়নি। যথা ইন্দ্রিয়বিষয়ক অনুমিতিস্থলে আমরা অনুমান করি যে রূপরসগন্ধস্পর্শ ইত্যাদির জ্ঞান নিশ্চয় ইন্দ্রিয়করণক যদিও ইন্দ্রিয়ত্বসামান্যের কোনও জ্ঞানই আমাদের থাকতে পারে না (ইন্দ্রিয়গুলি অতীন্দ্রিয় বলে)। তবে অন্যপ্রকারের করণ যথা কুঠারাদির জ্ঞান আমাদের আছে। সেই থেকেই আমরা ভাবি যে রূপাদিজ্ঞানেও ইন্দ্রিয়রূপ করণ নিশ্চয় আছে। এইভাবেই আমরা পূর্ববৎ এবং সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের পার্থক্য বুঝবো।

অবীত অনুমানের একটিই প্রকার—শেষবৎ। 'শেষ' শব্দটির অর্থ 'পরিশিষ্ট'—অর্থাৎ যা বাকি থাকে। এই আকারের অনুমানে অন্যত্র অপ্রাসঙ্গিক দেখিয়ে যেটি পরিশিষ্ট থাকবে সেখানেই অনুমিতি করা হয়। যেমন শব্দগুণ পৃথিবীতে, জলে, বায়ুতে, তেজে থাকতে পারে না—অতএব পরিশিষ্ট

আকাশেরই বিশেষ গুণ শব্দ। ন্যায়বার্তিকতাৎপর্যটীকায় বাচস্পতি এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন।

তৃতীয় প্রমাণ আপ্তশ্রুতি। নৈয়ায়িকরা যাকে শাব্দজ্ঞান বলেছেন সাংখ্যে তাকে অনুমানপূর্বক বলা হয়েছে। বাক্যের অর্থগ্রহণ করতে ইচ্ছুক বালক লক্ষ্য করে পিতামহ পিতাকে নির্দেশ দেবার সময় কোন্ কোন্ পদ ব্যবহার ক'রে বাক্য উচ্চারণ করলেন এবং সেই বাক্য শ্রবণ ক'রে পিতাই বা কোন্ কোন্ বস্তু আনলেন, রাখলেন ইত্যাদি। অন্যসময় আবার ঐ ঐ শব্দ উচ্চারিত না হওয়াতে কোন্ কোন্ বস্তু বাদ গেল তাও সে লক্ষ্য করে এবং এইভাবেই অন্বয়ব্যতিরেকের সাহায্যে তার শব্দের অর্থজ্ঞান হয়। শাব্দজ্ঞান হবার আগে পদ এবং পদার্থের সম্বন্ধের জ্ঞান হওয়া আবশ্যক এবং কোন্ পদের সঙ্গে কোন্ পদার্থের সম্বন্ধ এটি অনুমানের সাহায্যেই জানা যায়। অতএব শাব্দবোধের মূলে অনুমান থাকায় শাব্দবোধকে অনুমানপূর্বক বলা হয়। লৌকিক বাক্যের প্রামাণ্য আশঙ্কানিরসনের পরই স্থাপিত হয়। লৌকিক বাক্যের দোষ বক্তার দোষেই উৎপন্ন হয়ে থাকে। বক্তার দোষ চতুর্বিধ—(১) ভ্রম, (২) প্রমাদ, (৩) বিপ্রলিপ্সা এবং (৪) করণাপাটব। অর্থাৎ বক্তার মিথ্যাজ্ঞান, অনবধানতা, বিরুদ্ধ প্রলাপোক্তি বা ইন্দ্রিয়ের অপটুতা এর যে কোনও একটি থাকলেই লৌকিক বাক্য দুষ্ট হতে পারে। ঐ দুষ্টবাক্যজন্য বোধ অপ্রমাণ হবে। যুক্তিতর্কের দ্বারা বক্তার নির্দোষত্ব প্রমাণিত হ'লে তবেই শাব্দবোধের প্রামাণ্য নির্ধারিত হতে পারে। সুতরাং লৌকিক বাক্যজন্য জ্ঞানের প্রামাণ্য অনুমানমূলকই। কিন্তু আপ্তশ্রুতি বলতে তাঁরা অপৌরুষেয় বেদবাক্যজনিত সকলদোষমুক্ত জ্ঞানকেই বোঝান। এইগুলি স্বতঃ প্রমাণ। আদিবিদ্বান্ কপিল এই বেদবাক্যই কল্প হতে কল্পান্তরে স্মরণ করে রেখেছেন। সেইজন্যই তাঁর দর্শন দোষরহিত। বাচস্পতি তাঁর টীকায় এইভাবেই আপ্তশ্রুতির ব্যাখ্যা করেছেন। তবে আমরা তো পূর্বেই দেখেছি যে দুঃখের আত্যন্তিক বিমুক্তির উপায় বা পথ হিসাবে ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদ বা বেদের যাগযজ্ঞাদি সম্পর্কিত বিধি—সাংখ্য এই দুইয়ের কোনওটিই মেনে নেয়নি। তৎসত্ত্বেও বেদের প্রতি এই আনুগত্য স্বীকার কতটা সত্য এবং কতটা সুবিধাবাদীর মত ব্যবহার তা ভেবে দেখা উচিত।

অন্যান্য দর্শনে উপমান, অর্থাপত্তি ইত্যাদি যেসকল প্রমাণের কথা বলা হয়েছে সেগুলিকে অনুমানেরই অন্তর্ভুক্ত করা যায় বলে সাংখ্যে মত প্রকাশ

করা হয়েছে। অভাবও তাঁদের মতে প্রত্যক্ষেরই একটি প্রকার। প্রত্যেকটি জাগতিক বস্তুরই নিত্য পরিণাম ঘটছে। ভূতলে ঘটাভাব বলতে আমরা বুঝি ভূতলটির কৈবল্যলক্ষণ পরিণতি ঘটেছে। এই পরিণামী জগৎকে আমরা প্রত্যক্ষ করি। 'সম্ভব' অর্থাৎ বৃহত্তের জ্ঞান হ'তে তদন্তঃপাতী ক্ষুদ্রের জ্ঞান অনুমিতিই। 'ঐতিহ্য' কোনও প্রমা জ্ঞানই নয়—কেননা বক্তা অনির্দিষ্ট থাকায় ঐরকম বাক্য প্রমাজন্য জ্ঞান না দিয়ে সংশয়েরই জন্ম দেয়। আর যদি ঐ বাক্যের বক্তা কে তা জানা থাকে তবে শাব্দজ্ঞান সম্পর্কে আগে যা বলা হয়েছে তা এখানেও প্রযোজ্য হবে।

সাংখ্যদর্শনে প্রমাণখণ্ডে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সিদ্ধান্ত অবশ্যই প্রত্যক্ষবিষয়ক সিদ্ধান্ত। কেননা যদিও ন্যায়বৈশেষিকের মত সাংখ্যও ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষের কথা বলেন তবুও এই দুই সিদ্ধান্তের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। প্রথমত ন্যায়বৈশেষিকমতে জ্ঞান আত্মার বিশেষ গুণ। কিন্তু সাংখ্যমতে আত্মা বা পুরুষ যদিও চৈতন্যস্বরূপ তবুও জ্ঞান বা বুদ্ধি হচ্ছে অচেতন প্রকৃতির বিকার-মাত্র। যদি ন্যায়বৈশেষিক পরিভাষা ব্যবহার করি তবে সাংখ্যসিদ্ধান্তের বুদ্ধিকে দ্রব্যই বলতে হবে—গুণ নয়। দ্বিতীয়ত ন্যায়বৈশেষিক মতে জ্ঞানবান্ আত্মার আকারের কোনও পরিবর্তন হয় না—জ্ঞানের নিজেরও কোনও আকার বা আকারের পরিণাম নেই। ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ হ'লে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় সেটি একটি গুণবিশেষ এবং আত্মাতে আশ্রিত। আত্মা দেহাবচ্ছেদে ঐ গুণবিশিষ্ট হয় এবং দেহ না থাকলে ঐ গুণও তার থাকে না। কিন্তু সাংখ্য-মত এর বিপরীত। সাংখ্যমতে চিত্ত (যার অভিধেয় হচ্ছে মন, বুদ্ধি, অহংকার) ইন্দ্রিয়পথে নির্গত হয়ে বিষয়াকারে আকারিত হয়। এখানে সাংখ্যা-চার্যগণ ছাঁচে ঢালা গলিত ধাতুর উপমার সাহায্যে ব্যাপারটি প্রাঞ্জল করেন চিত্ত সর্বদা লেলিহান ও ইন্দ্রিয়পথে গলিতধাতুর ন্যায় নির্গত হয়ে বিষয়ের সঙ্গে সন্নিকৃষ্ট হ'লে তারই আকার ধারণ করে। ঐরূপ আকারিত চিত্ত যেহেতু সাত্ত্বিক তাতে চেতন পুরুষের প্রতিফলন হয় এবং জড়প্রকৃতিই 'যেন চেতনায়মান' হয়ে ওঠে। পরে ঐ আপাতচেতনায়মান চিত্তরূপা প্রকৃতি পুরুষে প্রতিফলিত হয়ে 'আমি জানছি' ইত্যাকার অবিদ্যার রূপ নেয়। প্রত্যক্ষের এই ব্যাখ্যা বেদান্তের ব্যাখ্যার খুবই কাছাকাছি। যদিও বেদান্ত যেহেতু শুদ্ধচৈতন্য ব্যতিরিক্ত আর কোনও পারমার্থিক সত্তা স্বীকার করেন না সেহেতু এই বৃত্তিজ্ঞানকে তাঁরা কখনই জড়াপ্রকৃতির তাত্ত্বিক পরিণাম বলে

স্বীকার করেননি। বরং তাঁরা প্রমাতৃচৈতন্য, বিষয়চৈতন্য ও প্রমাণচৈতন্য এই তিন চৈতন্যের একীভবনকেই প্রত্যক্ষ বলেছেন। তথাপি বেদান্তসিদ্ধান্তেও 'অন্তঃকরণ' সাংখ্যসিদ্ধান্তের 'চিত্তের' মতই বিষয়াকারে আকারিত হয় এবং জ্ঞান হতে গেলে বেদান্তমতেও অন্তঃকরণবৃত্তিকে সাক্ষীচৈতন্যের কাছে উপস্থাপিত হ'তে হয়—ঠিক যেমন সাংখ্যে চিত্তবৃত্তিকে চিৎস্বরূপ পুরুষের আলোকে উদ্ভাসিত হ'তে হয়। জ্ঞানে এই দুইয়ের সহযোগিতা বেদান্তের ক্ষেত্রে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করে না কেননা তাঁদের মতে অন্তঃকরণ তো পারমার্থিক সদ্বস্তু নয়। কিন্তু সাংখ্যে এই দ্বৈত ভাবনা বিশেষ বিবেচনার অপেক্ষা রাখে। বিশেষত সাংখ্যের পুরুষ যখন তত্ত্বতঃ নির্লিপ্ত অকর্তা সাক্ষীমাত্র তখন কর্ত্রী প্রকৃতির কোনওরূপ পরিণামই পুরুষে যদি বা প্রতিফলিত হয় তথাপি পুরুষের জ্ঞান হয় এরূপ বলা নিতান্তই অতাত্ত্বিক হবে।

প্রাসঙ্গিকভাবে আরও কয়েকটি কথা বলার আছে। ন্যায়বৈশেষিক মতে ইন্দ্রিয়গুলি ভৌতিক—যেমন চক্ষুরিন্দ্রিয় তেজঃপরমাণু, ঘ্রাণেন্দ্রিয় পৃথিবীপরমাণু, রসনেন্দ্রিয় জলপরমাণু, ত্বগিন্দ্রিয় বায়ুপরমাণু দ্বারা গঠিত। শ্রোত্রেন্দ্রিয় কর্ণশস্কুলি দ্বারা অবচ্ছিন্ন অর্থাৎ কর্ণগহ্বরের মধ্যস্থিত আকাশ। সাংখ্যাচার্যগণ কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলিকে অহঙ্কারতত্ত্বের সাত্ত্বিক বিকার বলেন। তাঁদের মতে এ জগতে যত প্রকার বিশেষ বিশেষ জ্ঞান উপস্থিত হয় তাদের সকলের সঙ্গেই একটি 'আমি' বা 'আমার' ভাব অনুস্যূত থাকে। অতএব ইন্দ্রিয়দ্বারা বিকৃত জ্ঞানের পূর্বে অবিকৃত অহংজ্ঞান আসে। এই অহংজ্ঞান যেহেতু বুদ্ধির বিকার এবং বুদ্ধি বা মহতের অব্যাপ্য যখন কিছুই নাই তখন ইন্দ্রিয়গণ যে তাদের অপেক্ষা বৃহত্তর বস্তুকে আয়ত্তে আনে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এই ইন্দ্রিয়গুলি অতি সূক্ষ্ম ও অতীন্দ্রিয়। দেহের অঙ্গে অঙ্গে দৃশ্যমান ইন্দ্রিয়গুলি ঐসব সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়মাত্র। যেমন চক্ষুর ক্ষেত্রে দৃশ্যমান গোলাকৃতি স্বচ্ছ কৃষ্ণসার—যাকে আমরা চলিত ভাষায় চোখের মণি বলি সেটিই সূক্ষ্ম চক্ষুরিন্দ্রিয়ের আশ্রয়। যখন কোনও বিষয়—যেমন ধরুন একটি গাছ ঐ কৃষ্ণসারের সামনে আসে তখন চিত্ত বা অন্তঃকরণ ঐ বিষয়ের দেশে গমণ করে ও বিষয়াকার প্রাপ্ত হয়। ঐ বিষয়াকারে আকারিত চিত্ত যখন আত্মচৈতন্যে উদ্ভাসিত হয় তখনই জ্ঞান হয়েছে বলা যায়। একথাও মনে রাখতে হবে যে চক্ষুগোলক দুইটি হলেও ইন্দ্রিয় একটি। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে আলোকের সাহায্য আবশ্যক

এবং কতকগুলি প্রতিবন্ধক থাকলে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না। প্রতিবন্ধক-গুলি হ'ল—

(ক) অতিদূরত্ব—যেমন ঊর্ধ্বাকাশের পাখী দেখা যায় না ;

(খ) অতিসামীপ্য—যেমন আপন চক্ষুর কাজল দেখা যায় না;

(গ) ইন্দ্রিয়বধ বা গোলকের বিকৃতি—যেমন চোখে ছানি পড়লে দেখা যায় না ;

(ঘ) অমনোযোগ—মন না দিলে সম্মুখের বস্তুও দৃষ্টি এড়িয়ে যায় ;

(ঙ) অতিসৌক্ষ্ম্য—অতিসূক্ষ্ম বস্তু যেমন পরমাণু দেখা যায় না ;

(চ) ব্যবধান—মধ্যে যদি দেওয়ালের বাধা থাকে তবে পাশের ঘরের বস্তুনিচয়ের প্রত্যক্ষ হয় না ;

(ছ) অভিভব—সূর্যের কিরণে অভিভূত হয়ে থাকে বলে দিনের আকাশে গ্রহনক্ষত্রাদি দেখা যায় না ;

(জ) সমানাভিহার—বৃষ্টির ফোঁটা পুকুরে পড়লে আর সেই ফোঁটার জল আলাদাভাবে দৃষ্টিগোচর হয় না।

প্রসঙ্গত সাংখ্যের ভ্রম বা অবিবেক সংক্রান্ত মতেরও ব্যাখ্যা করা উচিত। সাংখ্যমতে পুরুষ এবং প্রকৃতির বিবেকখ্যাতির অভাব থেকেই পুরুষের বদ্ধাভাস হয়। অর্থাৎ পুরুষ সত্য সত্যই বদ্ধ না হলেও প্রকৃতির থেকে নিজেকে ভিন্ন বলে জানে না বলেই সে প্রকৃতির রাজ্যের জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি সবকিছুই নিজেতে আরোপ করে। ভ্রম সম্বন্ধে সাংখ্যের প্রাচীন মত প্রাভাকর মীমাংসার অখ্যাতিবাদের সদৃশ। অর্থাৎ সাংখ্যমতেও জ্ঞান যতদূর হয় সবই যথার্থ; কিন্তু সম্পূর্ণ বিষয়টি অধিগত না হওয়ায় বিষয়টি ঠিকভাবে জানা হয় না। অতএব ভ্রম বস্তুত জ্ঞানের অপূর্ণতা বা অভাবমাত্র। পরবর্তী-কালে সাংখ্যসূত্রকার এই মতের পরিবর্তে সদসৎখ্যাতিবাদ সমর্থন করেন। এই মতের সঙ্গে কুমারিলের বিপরীতখ্যাতিবাদের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এই মতে জ্ঞান অসম্পূর্ণ আছে বললেই ভ্রমের ব্যাখ্যা হয় না। ভ্রমজ্ঞানে মনেরও কিঞ্চিৎ অবদান আছে। যেমন শুক্তিতে রজতভ্রমস্থলে পুরোবর্তী শুক্তির সঙ্গে রজতত্বের সংসর্গ যদিও নাই তবুও আমরা কল্পনাবলে ঐ সংসর্গের দ্বারা সংসৃষ্ট বস্তুকেই ভ্রমক্রমে দেখি। এ মত কিন্তু সৎকার্যবাদের সঙ্গে সুসঙ্গত নয়। কেন না সৎকার্যবাদী কখনই কার্যে নূতন কিছু উৎপন্ন হ'তে দেবেন না। তাই যদি হয় তবে যে সংসর্গ বস্তুস্থিতিতে নাই সেটিকে তাঁরা কোথা হতে উৎপন্ন

হতে দিলেন? বস্তুত প্রামাণ্য অপ্রামাণ্য বিষয়ে সাংখ্যমত ঠিক এই কারণেই ন্যায়বৈশেষিক পরতঃ প্রামাণ্য ও পরতঃ অপ্রামাণ্য মতের বিপরীত স্বতঃ-প্রামাণ্য ও স্বতঃ অপ্রামাণ্যবাদ। সাংখ্যাচার্যগণের যুক্তি হ'ল প্রমাজ্ঞানের প্রামাণ্য তার মধ্যেই ছিল এবং অপ্রমার অপ্রামাণ্যও তাই। সৎকার্যবাদীদের পক্ষে এছাড়া আর কিছুই বলা সম্ভব নয়। তবু প্রশ্ন ওঠে যে জ্ঞানের মধ্যেই যদি প্রামাণ্য অপ্রামাণ্য সবই অব্যক্ত অবস্থায় থাকে তবে তো যে কোনও জ্ঞানই প্রমা বা অপ্রমা হবার আশঙ্কা থাকে। উত্তরে সাংখ্যকার বলেন যে পারিপার্শ্বিক অন্যান্য কারণ—যেমন দূরত্ব, বিষয়ের অসম্পূর্ণ প্রকাশ বা সংস্কার ইত্যাদি বশেই ভ্রমের উৎপত্তি হয়। বাধা দূর হ'লে, বিষয়ের স্বরূপ-সাক্ষাৎকার হ'লে সত্য আপনিই প্রকাশিত হয়। বুদ্ধি সত্যেরই পক্ষপাতী।

সাংখ্যসিদ্ধান্তের মূল্যায়ন

সাংখ্যদর্শনের মূল্যায়ন করতে গেলে দুটি দিক বিবেচনা করতে হবে। প্রথমত সাংখ্যসিদ্ধান্তগুলি যুক্তিসিদ্ধ কি না—দ্বিতীয়ত বর্তমান জগতে বা মানবজীবনে এই সিদ্ধান্তগুলির কোনও প্রাসঙ্গিকতা আছে কি না। প্রথম প্রশ্নটির বিচারসূত্রে আমাদের সাংখ্যের বিশেষ সিদ্ধান্তগুলি পরীক্ষা করতে হবে—যথা, সাংখ্যের (ক) দ্বৈতবাদ (খ) সৎকার্যবাদ (গ) প্রকৃতির সদা-পরিণামবাদ (ঘ) বহুপুরুষবাদ (ঙ) নিরীশ্বরবাদ।

অনেক দার্শনিকই চরম দ্বিতত্ত্ববাদকে (জড় ও চেতন) বিশেষ সন্দেহের চক্ষে দেখে থাকেন। দ্বিতত্ত্ববাদের মৌলিক অসুবিধা হ'ল জগৎসংসারের বিবিধের মাঝে যে সমন্বয় দেখা যায়—অর্থাৎ আপাতদৃষ্ট বৈচিত্র্যের অন্তরালে যে ঐক্য ও ব্যবস্থা দেখা যায় দুইটি পরস্পরবিরোধী অন্তিম সত্তা কল্পনা করলে তাঁর উপপত্তি করা অতি কঠিন হয়ে পড়ে। যেমন দেখি যে অচেতন অথচ কর্ত্রী প্রকৃতি এবং চেতন অথচ অকর্তা পুরুষের দ্বৈতভাব কেমন করে এই জগতের ব্যাখ্যা দেবে তা বলতে গিয়ে সাংখ্যকারগণ যতগুলি ন্যায় বা উপমার সাহায্য নিয়েছেন তাদের কোনওটিই দোষমুক্ত নয়। পঙ্গ্বন্ধন্যায়ে পঙ্গু এবং অন্ধ উভয়েই চেতন—একজনও প্রকৃতির মত অচেতন নয়। গাভীর দুগ্ধদানের যে উপমা তাঁরা দেন সেটিও ঠিক নয় কেননা গাভী মাতৃস্নেহবশতঃ দুগ্ধদান করে—একেবারে অচেতনভাবে দান করে একথা বলা বোধহয় ভুল। বস্তুত সমস্যা আরও গভীরে। প্রকৃতি কেন পরিণত হয়—গুণগুলি সাম্যাবস্থা ত্যাগ

করে কেন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে সংসারসৃষ্টি করতে শুরু করে এর উত্তরে সাংখ্যাচার্যগণ বলেন যে পুরুষসন্নিধিবশতঃ পুরুষের কৈবল্যার্থে প্রকৃতি আপনাকে দর্শন করায়। এ বিষয়ে দুইটি বিবেচ্য আছে। প্রথমত পুরুষসন্নিধানবশতই যদি প্রকৃতির অভিব্যক্তি হয় তবে সেই 'সন্নিধান' তো নিত্য। কেননা 'সন্নিধান' বলতে সাংখ্যকার নিশ্চয় এখানে দৈশিক বা কালিক সন্নিধান বোঝাননি। অকর্তা এবং অপরিণামী নিত্য চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ যদি কোনও অর্থে 'সন্নিহিত' হ'ন তবে তা কখনই দেশে বা কালে এই অর্থে নয়। এই দেশকালাতীত আমাদের জ্ঞানের অগম্য সন্নিধান নিশ্চয় নিত্য কেননা পুরুষ বিভু। এ অবস্থায় আমরা বলতে বাধ্য হব যে সংসার-নিবৃত্তি তাহলে অসম্ভব। সাংখ্যশাস্ত্র সেক্ষেত্রে তার প্রয়োজনই হারিয়ে ফেলবে। অবশ্য পুরুষসন্নিধি ব্যতিরিক্ত অবিবেকও যদি প্রকৃতির পরিনামের নিমিত্তকারণ হয় তাহলে সংসারের নিবৃত্তি অবিবেকের নিবৃত্তির সঙ্গেসঙ্গেই হওয়া সম্ভব। দ্বিতীয়ত এই পুরুষ যেহেতু ত্রিগুণাতীত এবং তত্ত্বতঃ কেবল অর্থাৎ প্রকৃতি হ'তে সম্পূর্ণ বিবিক্ত নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত এর কৈবল্যের জন্য এই সংসারসর্গ নিষ্ফল প্রয়াস বা সিদ্ধসাধনমাত্র। সেক্ষেত্রে চিন্তার স্বাভাবিক ঝোঁক হয় প্রকৃতির পরিণামকে মায়িক বলে শেষ অবধি প্রকৃতিকে কোনও অনির্বচনীয় অধ্যাস বলে সত্য এবং অলীকের মাঝামাঝি একটা স্থান দেওয়ার—যেমন শঙ্কর তাঁর অদ্বৈত-বেদান্তে করেছিলেন। 'বস্তুত সাংখ্যকার প্রকৃতিকে পুরুষের মতই অজা, নিত্যা এবং তাত্ত্বিক বললেও ভারতীয় বহু দার্শনিকের মতই তিনিও কার্যত প্রকৃতিকে অবজ্ঞাই করেছেন। আত্মা বা পুরুষের কৈবল্যই তাঁর দৃষ্টিতে পুরুষার্থ। এইজন্য প্রাকৃতিক দুঃখের প্রাকৃতিক মোচনের প্রতি উদাসীন থেকে—'এই দুঃখ আমার নয়—আমি দৃক্‌এ দৃশ্য—দৃশ্যের বিকার দৃক্‌কে আচ্ছন্ন করে না'—এই ভাবের সাধনার উপরই তাঁরা জোর দিয়েছেন। অর্থাৎ জড়কে স্বীকার করেও হেয়জ্ঞানে তাকে পরিত্যাগ করাকেই তাঁরা শ্রেয় বলে মনে করেছেন। জগৎ ও জীবনের প্রতি এই নেতিবাচক মনোভাব ভারতীয় দর্শনের এক বিচিত্র বৈশিষ্ট্য। এর সুফল যদি কিছু থাকে তবে সেটা প্রকাশ পাবে একমাত্র নিরাসক্ত বৈরাগীর চরিত্রে। সাধারণ সামাজিক জীব যদি এই দর্শন জীবনে প্রয়োগ করার প্রয়াস করে তবে সে দেখবে যে তার দর্শন ও ব্যবহারিক জীবন পদে পদে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। অতঃপর তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হবে নানাবিধ স্বার্থসন্ধী অপচেষ্টাকে—"ও তো প্রকৃতির রাজ্যে ঘটছে,

ওর দ্বারা আমি লিপ্ত হচ্ছি না”—এই বলে ব্যাখ্যা করার। এতদূর যদি সে নাও যায় তবুও প্রকৃতির রাজ্যে কোনওরকম পরীক্ষা, নিরীক্ষা, বিজ্ঞান, আলোচনা, প্রাত্যহিক সামাজিক জীবনে সুস্থ সংস্কারমুক্ত হওয়া ইত্যাদি বিষয়ে তার ঔদাসিন্য আসাই স্বাভাবিক—কেন না সে মনে করবে অহঙ্কার-বিমূঢ় যদি না হই তবে প্রকৃতির রাজ্যে যাই ঘটুক না কেন আমি তাতে বিচলিত হব কেন? বস্তুত এই কারণেই সাংখ্যদর্শন পুরুষের মুক্তি না এনে সর্বতোভাবে আমাদের ব্যবহারিক জীবনে একধরনের অনাস্থা এনেছে। বর্তমানযুগে ‘কৈবল্য’ নামক পুরুষার্থের প্রাসঙ্গিকতা স্বীকার করতে যে প্রবল বৈরাগ্যের প্রয়োজন তা আমাদের পক্ষে অর্জন করা অসম্ভব। ভোগের সামগ্রী যার করায়ত্ত মাত্র সেই ত্যাগ করতে পারে। যে আপনার অসামর্থ্যে ভোগের সামগ্রী উৎপন্নই করতে পারে না সে তার ব্যর্থ লালসাকে ‘বৈরাগ্য’ নাম দিলেও সেটা প্রকৃত বৈরাগ্য নয়। সাংখ্যাচার্যগণের সপক্ষে এই কথাই বলা যায় যে গৃহীর জন্য এই শাস্ত্র তাঁরা প্রণয়ন করেননি। একমাত্র মুমুক্ষুই এর যথার্থ অধিকারী। আর মুমুক্ষুর সংখ্যা কোনও দেশে বা কোনও কালেই অগণন হতে পারে না।

সাংখ্যের সৎকার্যবাদ অবশ্য যুক্তিগ্রাহ্য এবং এই মত স্বীকার করার ফলেই সাংখ্য প্রকৃতিতত্ত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। ভাববাদী দর্শনে অনাত্ম বা অচিৎকে যে চিত্তের বা আত্মার অধ্যাস বলা হয়ে থাকে তা স্বীকারের পথে এই সৎকার্যবাদই সাংখ্যের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু প্রকৃতির পরিণামের বা অভিব্যক্তির যে ক্রমটি সাংখ্যশাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে সেটি বাস্তব বহির্জগতের অভিজ্ঞতা হ’তে লব্ধ নয়। আপনার মানস বা অন্তর্জগতের ক্রমিক অভি-ব্যক্তিকেই জাগতিক অভিব্যক্তি বলে সাংখ্যকার সূচিত করেছেন। এর ফলে আমাদের বহির্জগতের অভিজ্ঞতায় যেটি আগে সাংখ্যে সেটি ক্রমিকভাবে পরে আসে। যেমন ঐন্দ্রিয়কজ্ঞানের পর অহংবুদ্ধি আসে এই আমাদের অভিজ্ঞতা কিন্তু সাংখ্যকার বলেন অহঙ্কারের বিকৃতি হল ইন্দ্রিয়গণ। এক্ষেত্রে সাংখ্যের ব্যাখ্যায় ভাববাদী ঝোঁক দেখা যায়। অবশ্য একথা বলা যায় জ্ঞানের পৌর্বাপর্যের দ্বারা বস্তুর পৌর্বাপর্য নির্ণীত হয় না।

সাংখ্যে প্রকৃতির অভিব্যক্তির যে ক্রম দেওয়া হয়েছে সেটিকে অনুধাবন করলে যা দেখি পুরুষতত্ত্বের পক্ষে যে যুক্তিগুলি হয়েছে সেগুলিকে বিশ্লেষণ করলেও একই দোষ দেখা যায়। প্রকৃতি যেহেতু ত্রিগুণা এবং নিত্য পরিণামী

সংঘাত সেহেতু তার বিপরীতকে স্বীকার করতে আমরা বাধ্য কেননা গুণগুলি সংঘাত বলে পরার্থ সুতরাং তাদের বিপরীত নির্গুণের অপেক্ষায় এবং পরিণাম বিকারহীনতার অপেক্ষায়ই মাত্র বোধগম্য হয়—নচেৎ নয় এই হ'ল তাঁদের যুক্তি। এ যুক্তিতে কোনও দোষ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল যে গুণ এবং পরিণাম সদ্বস্তু বলেই যে পরিপ্রেক্ষিতে তাদের বোঝা যায় সেটিও সদ্বস্তু একথা কেমন করে বলা যায় ? সাংখ্যকার নিজেই স্বীকার করেছেন যে বুদ্ধি কল্পনার সাহায্যে অনেক কিছুই অঙ্গীকৃত করতে পারে। আরও বিবেচ্য এই যে শুদ্ধচৈতন্যরূপ পুরুষ তাত্ত্বিক কি না এ বিষয়ে তর্ক উঠতে পারে। কেন না সাধারণ অভিজ্ঞতায় শুদ্ধ চৈতন্য কখনই প্রকাশ পায় না। সূক্ষ্মতম অবস্থাতেও অহঙ্কারের দ্বারা অনুস্যূত বুদ্ধিই আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়। অর্থাৎ যুক্তিগুলির সাহায্যে পুরুষের পরোক্ষ জ্ঞানই সম্ভব। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের জন্য অন্য উপায়।

যাই হোক্ সাংখ্য যেমন পরিণামী প্রকৃতিকে স্বীকার করেছে তেমন অকর্তা সাক্ষী পুরুষকেও স্বীকার করেছে। প্রকৃতি এক তার বিপরীত পুরুষ বহু এমন সিদ্ধান্ত সাংখ্যশাস্ত্রে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু বহুপুরুষবাদের পক্ষে সাংখ্যের যুক্তিগুলি যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। এ বিষয়ে আমরা পূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সাংখ্যসিদ্ধান্তে পুরুষের জন্ম, মরণ, জ্ঞানলাভ, প্রবৃত্তি ইত্যাদি নিতান্তই অবিবেকজনিত। এ সকলই প্রাকৃতিক পরিণাম মাত্র। গীতাকার বলেছেন—এই আত্মা জন্মায়ও না, মরেও না, আগেও হয়নি পরেও হবে না, এ অজ নিত্য শাশ্বত পুরাণ—শরীর নষ্ট হলেও এ নষ্ট হয় না। একে সংসারের কোনও অস্ত্র, জল, অগ্নি বা বায়ু ক্লিষ্ট করতে পারে না—এ অবিনাশী। এই যে শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ নির্লিপ্ত পুরুষ এর ভেদক হিসাবে বিভিন্ন দেহ এবং অন্তঃকরণগুলিকেই ধরতে হয়। অর্থাৎ দেহভেদে এবং অন্তঃকরণভেদে শুদ্ধচৈতন্যও ভিন্ন হতে বাধ্য। কিন্তু এই ভেদ যদি তাত্ত্বিক বলেও স্বীকৃত হয় তবুও তো সে প্রকৃতির ভেদ, শুদ্ধচৈতন্যের ভেদ তো নয়। এক্ষেত্রে প্রতিসংবেত্তার প্রসঙ্গ উত্থাপনও নিরর্থক। প্রতিসংবেত্তার সামনে যে বিষয়গুলি উপস্থাপিত হয় যদি সেগুলি ব্যক্তিভেদে ভিন্নও হয় তবুও ঐ বিষয়গুলির (অর্থাৎ বুদ্ধি ইচ্ছা সুখ দুঃখাদির) সঙ্গে প্রতিসংবেত্তার সম্বন্ধটিকে স্বাভাবিক কল্পনা করলে শুদ্ধচৈতন্যকে বিশিষ্ট বলে স্বীকার করতে হয়। সাংখ্যশাস্ত্রের পক্ষে এরূপ স্বীকৃতি অসম্ভব। অথচ বিশেষণরহিত অবস্থায় অর্থাৎ বিষয়দ্বারা অবিশিষ্ট অবস্থায়

শুদ্ধচৈতন্যের ভেদের নিয়ামক কোথায়? আরও বিবেচ্য এই যে প্রতিসংবেত্তা পুরুষ স্ববোধে প্রত্যগাত্মরূপে ভাসিত হন—সাংখ্যমত এই। ঐ স্ববোধে অবশ্যই অপর আত্মার সঙ্গে নিজের তাদাত্ম্য কখনই ভাসিত হয় না। এতদূর অবধি স্বীকার করতে আমাদের কোনও বাধা নেই। কিন্তু এর পরই প্রশ্ন ওঠে "স্বভিন্ন অপর আত্মাকে জানবার উপায় কি? প্রকৃতিকে যেমন করে জানি তেমন করে তো পুরুষকে জানা যায় না। তবে আমি অপর পুরুষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হব কি করে? জগতের সর্বত্র দার্শনিকরা solipsism নামক অন্ধকূপে ঢুকে যেমন বার হবার রাস্তা পাননি সাংখ্যদার্শনিকেরও এক্ষেত্রে সেই একই দুরবস্থা হয়েছে। বহুপুরুষবাদ ওভাবে স্থাপন করা যায় না। বস্তুত পুরুষ বহু না বলে জীব বহু বললে সমস্যা কমে। নচেৎ দ্বিতত্ত্ববাদ পরিত্যাগ করে এক অখণ্ড সত্তাকে স্বীকার করে নিতে হয়। এই এক সত্তের মধ্যে প্রকৃতি-পুরুষ অঙ্গাঙ্গী এবং অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত থাকায় প্রকৃতিতে যা ঘটে পুরুষকে তা স্পর্শ করবেই। সেক্ষেত্রে প্রকৃতিকেও এক না বলে পুরুষপ্রকৃতি দেহভেদে অন্তঃকরণভেদে দেশকালভেদে বহু এবং অনিত্য স্বীকার করতে হবে—কেবল মূল উদাসীন সত্তাটিই নিত্য এবং এক এরূপ সিদ্ধান্ত করতে হবে। কিন্তু তাহলে তো সাংখ্যসিদ্ধান্তের মূলোচ্ছেদ ঘটে। সাংখ্যকারের তো তা অভিপ্রেত হতে পারে না। তবে সাংখ্যকারের অভিপ্রায় কি ছিল সেটি একটু অনুধাবন করে দেখা যাক্। প্রথমত তাঁরা কোনও সময়ই 'আত্মন্' বা 'ব্রহ্মন্' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেননি। তাঁদের শাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দ হ'ল 'পুরুষ'। এই পুরুষের সঙ্গে প্রকৃতির এবং তার দেহেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধি অহঙ্কার ইত্যাদি বিকৃতির সান্নিধ্য আছে। এক একটি পুরুষের সঙ্গে এক একটি বিশেষ দেহেন্দ্রিয়াদিরই সান্নিধ্য হয় কেননা সকল পুরুষ নির্বিশেষে সকল দেহেন্দ্রিয়াদিরই জন্ম মরণ প্রবৃত্তি আদির দ্রষ্টা বা ভোক্তা হন্ না। এ কথাও মনে রাখতে হবে যে সাংখ্যমতে পুরুষ স্বরূপতই 'দ্রষ্টা'। এই 'দ্রষ্টা'- শব্দটির তাৎপর্য এই যে পুরুষ উদাসীন সাক্ষী। দৃশ্য বা প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিলোপ তো সাংখ্যসিদ্ধান্তে স্বীকৃত নয়। অতএব যদি-বা অকর্তা দ্রষ্টা পুরুষ উদাসীনভাবে প্রকৃতির একটি বিশেষ বিকৃতিগুচ্ছকে দর্শন করতে থাকেন তাতে শুদ্ধচৈতন্য বিশিষ্ট হয়ে গেল কি না এ সম্ভাবনা নিয়ে সাংখ্যাচার্যগণ উদ্বিগ্ন হবেন না। যদিও বিস্ময়ের সঙ্গেই লক্ষ্য করি যে বিষয়নির্বিশেষ শুদ্ধচৈতন্যের কল্পনা

বেদান্তে যেমন আছে—সাংখ্যাচার্যগণও কৈবল্যাবস্থায় বিষয়বিরহিত শুদ্ধ-চৈতন্যাত্মক পুরুষেরই কল্পনা করেছেন।

স্বভিন্ন অপর আত্মাকে জানবার উপায় সম্বন্ধে সাংখ্যাচার্যগণ স্পষ্ট করে কোথাও কিছু না বললেও একথা বেশ বোঝা যায় যে যেহেতু তাঁরা এইরকম কোনও অসুবিধার কথা কোথাও বলেননি সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি যে নৈয়ায়িকদের মতন তাঁরাও প্রবৃত্তি দেখেই অপর আত্মার অনুমিতি হয় এটিই স্বীকার করবেন। এবং যেহেতু অনুমান প্রত্যক্ষের মতই স্বীকৃত প্রমাণ সুতরাং অপর আত্মার জ্ঞান হওয়ার পথে কোনও বাধাই তাঁরা মানবেন না।

সাংখ্যের নিরীশ্বরবাদ সম্ভবত ঈশ্বরনিষেধের প্রাচীনতম দার্শনিক প্রচেষ্টা। ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়গুলির মধ্যে বৌদ্ধ, জৈন, সাংখ্য, মীমাংসা এবং প্রাচীন বৈশেষিক ও শঙ্করবেদান্ত (পারমার্থিক অর্থে) নিরীশ্বরবাদী। সুতরাং নিরীশ্বরবাদ পাশ্চাত্যদেশে যত ঘৃণিত এদেশে তত নয়। বস্তুত নিত্য আত্মা স্বীকৃত হ'লে এবং শ্রুতির বিরোধিতা না করলে কোনও দর্শনকেই প্রাচীনেরা ত্যাজ্য বলে মনে করতেন না। তাছাড়া প্রাচীন নিরীশ্বরবাদীরা তাঁদের মতকে নিতান্তই তর্কের দ্বারা সিদ্ধ একটি বিচ্ছিন্ন সিদ্ধান্ত বলে মনে করতেন। সমাজ ও জীবনের নানা দিকের সঙ্গে নিরীশ্বরবাদের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে সামাজিক বিকাশ ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির উপর প্রতিষ্ঠিত না হ'লে নিরীশ্বরবাদ যে বন্ধ্যা এবং সঙ্কীর্ণ পণ্ডিতগোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ মতবাদ হয়েই পড়ে থাকে—জীবনের ধর্ম হয়ে ওঠে না এ বিষয়ে তাঁরা নিশ্চয় অবহিত ছিলেন না। না হ'লে বহুবিধ সামাজিক কুসংস্কার, অতিপ্রাকৃত চিন্তা, বহু দেবদেবীর কল্পনা ইত্যাদির সঙ্গে নিরীশ্বরবাদ এভাবে সহাবস্থান করল কি করে? জনসাধারণে যেভাবে কপিল এবং বুদ্ধের মূর্তিপূজা করেন ঈশ্বরবাদীর পূজার থেকে তা কিছু ভিন্ন বলে তো প্রতীত হয় না। ত্রিবিধ দুঃখের বর্ণনা দিতে গিয়ে সাংখ্যকার পিশাচাদির উল্লেখ করেছেন। যজ্ঞের অলৌকিক বা পারলৌকিক ফলকেও তিনি অস্বীকার করেননি। কেবল এইগুলি যে কৈবল্যরূপ পরম-পুরুষার্থ নয় এই কথাটাই আমাদের স্মরণ রাখতে বলেছেন। কিন্তু কৈবল্য শুধু মুষ্টিমেয়েরই পুরুষার্থ। সুতরাং কপিল নিরীশ্বরবাদের পক্ষে যতই যুক্তিজাল বিস্তার করুন সাধারণের জীবনে তার প্রভাব অতি অল্পই পড়েছে।

তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে যুক্তির প্রবলতায় এবং তীক্ষ্ণতায় কপিল সর্বকালের জন্যই ঈশ্বরচিন্তার অন্তর্নিহিত অসঙ্গতি প্রকাশ করতে বিশেষ-ভাবেই সক্ষম হয়েছেন। এবং কাল নিরবধি, পৃথ্বীও বিপুল, সুতরাং কপিলের চিন্তার ফল এক না এক সময়ে অনুভূত হবেই এই আশা করা যায়।

সংযোজনী

(ক) প্রসিদ্ধ সাংখ্যাচার্যগণ—

কপিল, সনক, সনন্দ, সনাতন, আসুরি, পঞ্চশিখ, বিন্ধ্যবাস, বর্ষগণ্য, জৈগীষব্য, বোঢ়ু।

(খ) সুপ্রাপ্য সাংখ্যগ্রন্থের তালিকা—

	গ্রন্থ	গ্রন্থকার
(১)	ষডাধ্যায়ীসূত্র বা সাংখ্যপ্রবচন	—কপিল
(২)	তত্ত্বসমাসসূত্র	— ঐ
(৩)	সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য	—বিজ্ঞানভিক্ষু
(৪)	সাংখ্যবৃত্তি	—অনিরুদ্ধ ভট্ট
(৫)	সাংখ্যসপ্ততি (কারিকা)	—ঈশ্বরকৃষ্ণ
(৬)	তত্ত্বকৌমুদী	—বাচস্পতি মিশ্র
(৭)	সাংখ্যসার	—বিজ্ঞানভিক্ষু
(৮)	রাজবৃত্তি	—ভোজরাজ

(গ) সাংখ্যের পারিভাষিক শব্দ—

১। অধ্যবসায়	২। অনুমান	৩। অহঙ্কার
৪। অন্তঃকরণ	৫। আধ্যাত্মিক	৬। আধিদৈবিক
৭। আধিভৌতিক.	৮। আপ্তশ্রুতি	৯। করণ
১০। কৈবল্য	১১। চিত্ত	১২। জ্ঞ
১৩। তন্মাত্র	১৪। তমঃ	১৫। দৃক্
১৬। দৃশ্য	১৭। দ্রষ্টা	১৮। পঞ্চভূত
১৯। পুরুষ	২০। প্রধান	২১। প্রকৃতি
২২। বুদ্ধি	২৩। বিকৃতি	২৪। ব্যক্ত
২৫। মহৎ	২৬। রজঃ	২৭। লিঙ্গ-শরীর
২৮। সত্ত্ব		

(ঘ) পুরুষ ও ব্যক্তাব্যক্তের ভেদ

ব্যক্তাব্যক্ত-ত্রিগুণ, অবিবেকি, বিষয়, সামান্য, অচেতন, প্রসবধর্মি

পুরুষ—অগুণ, বিবেকী, অবিষয়, অসামান্য, চেতন, অপ্রসবধর্মি।

(ঙ) পুরুষ, ব্যক্ত ও অব্যক্তের সাধর্ম্য বৈধর্ম্য

ব্যক্ত	অব্যক্ত	পুরুষ
হেতুমৎ	অহেতুমৎ	অহেতুমান্
অনিত্য	নিত্য	নিত্য
অব্যাপি	ব্যাপি	ব্যাপী
সক্রিয়	নিষ্ক্রিয়	নিষ্ক্রিয়
অনেক	এক	অনেক
আশ্রিত	অনাশ্রিত	অনাশ্রিত
লিঙ্গ	অলিঙ্গ	অলিঙ্গ
সাবয়ব	নিরবয়ব	নিরবয়ব
পরতন্ত্র	স্বতন্ত্র	স্বতন্ত্র

(চ) প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি।

উপনিষদ্

কঠ। ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা, অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ ॥৩।১০
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাত্ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥৩।১১

শ্বেতাশ্বতর।

জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশাবজা হ্যেকা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা।
অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপো হ্যকর্তা ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ ॥১।৯।
ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ।
তস্যাভিধ্যানাদ্যোজনাত্তত্ত্বভাবাত্ ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ ॥১।১০
অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজা হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ ॥
৪।৫

সাংখ্যসূত্র। (ঈশ্বরনিষেধক)

ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ।১।৯২।

মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্নতৎসিদ্ধিঃ।১।৯৩।

উভয়থাপ্যসৎকরত্বম্।১।৯৪।

মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাসাসিদ্ধস্য বা।১।৯৫।

নেশ্বরাধিষ্ঠিতে ফলনিষ্পত্তিঃ কর্মণা তৎসিদ্ধেঃ ।৫।২।

স্বোপকারাদধিষ্ঠানং লোকবৎ ।৫।৩।

লৌকিকেশ্বরবদিতরথা ।৫।৪।

পারিভাষিকো বা ।৫।৫।

ন রাগাদৃতে তৎসিদ্ধিঃ প্রতিনিয়তকারণত্বাৎ ।৫।৬।

তদ্‌যোগেঽপি ন নিত্যমুক্তঃ ।৫।৭।

প্রধানশক্তিযোগাচ্চেৎ সঙ্গাপত্তিঃ ।৫।৮

সত্তামাত্রাচ্চেৎ সর্বৈশ্বর্যম্ ।৫।৯।

প্রমাণাভাবাৎ ন তৎসিদ্ধিঃ ।৫।১০।

সম্বন্ধাভাবান্নানুমানম্ ।৫।১১

শ্রুতিরপি প্রধানকার্যত্বস্য ।৫।১২

গীতা —

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥ ৩।৭

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে ।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্‌বিদঃ ॥১৩।১

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরঃ ॥১৩।৫

ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ১৩।৬।

কার্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে ।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥ ১৩।২০

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা ।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্ ॥ ১৩।৩৪

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিণমব্যয়ম্ ॥ ১৪।৫

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্মণি ভারত ।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ ১৪।৯

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্ ।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥ ১৪।২০

পাতঞ্জল যোগদর্শন

ভারতীয় দর্শনে একটি প্রাচীন ঐতিহ্য আছে যে কাপিল সাংখ্য ও পাতঞ্জল যোগদর্শন একই মূলতন্ত্রের দুইটি বিশেষ প্রকাশ। সাংখ্যে তত্ত্বালোচনাই প্রাধান্য পেয়েছে আর পাতঞ্জল শাস্ত্রে প্রয়োগবিধির উপরই জোর দেওয়া হয়েছে। তত্ত্ববিচারে একটি ছাড়া অপর সকল সিদ্ধান্তই সাংখ্য-পাতঞ্জলে সমান। পৃথক্ সিদ্ধান্তটি ঈশ্বরবিষয়ক। এইজন্যই প্রাচীন পণ্ডিতেরা অনেক সময় সাংখ্য ও যোগ উভয়কেই সাংখ্যনামেই অভিহিত করেন। তবে ভেদ নির্দেশ করবার জন্য তাঁরা কাপিলশাস্ত্রটিকে নিরীশ্বর এবং পাতঞ্জলটিকে সেশ্বর সাংখ্য বলে থাকেন। গীতার পঞ্চম অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখে শোনা যায়—

> সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
> একমপ্যাস্থিতঃ সম্যক্ উভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥ ৫।৪
> যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি গম্যতে।
> একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫।৫

অর্থাৎ সাংখ্য ও যোগকে বালকেই পৃথক্ জ্ঞান করে। পণ্ডিতেরা তাদের এক বলেই জানেন। তাদের মধ্যে একটিকে ঠিক করে জানলেই উভয়কে জানার ফল পাওয়া যায়। বিস্তৃত আলোচনাকালে আমরাও পরে দেখবো যে প্রকৃতিপুরুষের দ্বৈতবাদ, বহুপুরুষবাদ কৈবল্য, চিত্তবৃত্তিনিরোধ, বিবেকখ্যাতি ইত্যাদি বহুসিদ্ধান্তই উভয়দর্শন সম্মত। তবুও এ প্রসঙ্গে কয়েকটি তথ্য আমাদের বিশেষ বিবেচনা করা উচিত। প্রথম, প্রয়োগবিদ্যা হিসাবে যোগের ইতিহাস অতি প্রাচীন। প্রাগার্য মহেঞ্জোদাড়ো হরপ্পার সিন্ধুসভ্যতার ধ্বংসাবশেষ হতে যোগীপুরুষের আবক্ষমূর্তি পাওয়া গেছে। তার অর্ধনিমীলিত চক্ষু ও জটাজুট স্পষ্টই তাকে যোগী বলে চিহ্নিত করে। গীতাতেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যোগের এক অতি প্রাচীন ইতিহাস অর্জুনের কাছে বিবৃত করেন। সর্গের প্রারম্ভে ভগবান্ স্বয়ং বিবস্বানকে এবং তিনি মনুকে যোগ শিক্ষা দিয়েছিলেন। মনু হতে পরম্পরাক্রমে রাজর্ষিগণ এই গুহ্যবিদ্যা শিখেছিলেন। কিন্তু কালে তা নষ্ট হয়ে যায়। এখন ভগবান্ স্বয়ং আগ্রহী হয়ে তা পুনরুদ্ধার করবেন। সেই পুরাতন যোগই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে শিক্ষা দিচ্ছেন।

দ্বিতীয়ত, যোগ যে শুধু সাংখ্যমতাবলম্বীর কাছেই আদরণীয় তা নয়। বৌদ্ধ, জৈন, বেদান্ত ইত্যাদি সিদ্ধান্তেও যোগের একটি বিশেষ স্থান আছে। অশ্বঘোষ তাঁর বুদ্ধচরিতে লিখেছেন যে বুদ্ধদেব সাংখ্যশাস্ত্র শিক্ষা করেছিলেন অরাড কালমের নিকট হ'তে এবং সে শাস্ত্র শিখতে তাঁর মাত্র একদিন সময় লেগেছিল। কিন্তু অরাড়ের কাছে শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি রুদ্রকরামপুত্রের কাছে যান এবং অশ্বঘোষের মতে সেখানে ছয় বৎসর শিক্ষা সমাপ্ত করে তবে তিনি সাধনে প্রবৃত্ত হন। এই রুদ্রকরামপুত্র যে তাঁকে যোগবিদ্যা দান ক'রে ছিলেন তার সপক্ষে নিম্নোক্ত তথ্যগুলি পাওয়া যায়। যোগে চিত্তবৃত্তি নিরোধ ও সমাধির উল্লেখ পাই। বুদ্ধদেবও আসন প্রাণায়ামাদিপূর্বক সমাধিসাধন করেছিলেন। মারজয়ের যে বিবরণ বৌদ্ধশাস্ত্রে পাই তা হ'ল কাম, ক্রোধ, ভয়, নিদ্রা ও শ্বাস দমন করে ধ্যানমগ্ন হওয়া। যোগেও এই সাধনশিক্ষা দেওয়া হয়। কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে বুদ্ধদেব যোগের কঠোর আচরণ করে তাতে কিছু ফল হয় না দেখে মধ্যমার্গ ধরেন। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে যোগেও ব্যর্থ কঠোরতা নিষিদ্ধ আছে। পরন্তু পালিতে পধানসুত্তে কঠোর তপস্যারই বিধান দেওয়া আছে। শীলসাধনার অঙ্গ হিসাবে যে সম্যক্ ব্যায়াম, স্মৃতি ও সমাধির উল্লেখ পাই যোগের ক্রিয়ার সঙ্গে তাদের দর্শনীয় সাদৃশ্য আছে। জৈন ঐতিহ্যেও আছে যে বুদ্ধের অগ্রজ সমসাময়িক বর্ধমান বা মহাবীর যোগবিদ্যায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। জৈন সাধনার অঙ্গ হিসাবে যোগের যম নিয়মাদি বিহিত আছে। চাণক্যপণ্ডিত পরবর্তীকালে তাঁর অর্থশাস্ত্রে সাংখ্য, যোগ ও লোকায়ত এই তিনটিকেই আন্বীক্ষিকী বা ন্যায়োপজীবি দর্শন বলে উল্লেখ করেছেন। আরও পরবর্তী যুগে বেদান্ত-দর্শনের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সদানন্দ প্রণীত 'বেদান্তসারে' যোগের প্রয়োগবিধির বিস্তারিত আলোচনা পাই। এই তথ্যগুলি বিচার করলে বোঝা যায় যে তাত্ত্বিকমত নির্বিশেষে প্রায় সকল প্রাচীন ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রেই প্রায়োগিক-বিদ্যা হিসাবে যোগ বিশেষ সমাদরের সঙ্গে গৃহীত হয়েছিল। বস্তুত প্রতীচ্যে এখনও অনেক সময়ই 'যোগী' এবং 'ভারতীয় দার্শনিক' এই দুটিকে পর্যায়শব্দ বলেই অনেকে মনে করেন। অর্থাৎ পাতঞ্জল দর্শনের তাত্ত্বিক ভিত্তি যে কাপিলসিদ্ধান্তই হতে হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। তবে বিস্তারিত আলোচনার সময় আমরা দেখবো যে যোগের প্রয়োগবিদ্যার তাত্ত্বিক ভিত্তি কাপিলমত ধরলে চিন্তার সঙ্গতি অতি সহজেই রক্ষা করা যায়। বোধহয়

এই কারণেই কালিবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় বলেছেন যে সাংখ্য দুই—অর্থাৎ কাপিল ও পাতঞ্জল—বর্তমান যুগের ভাষায় সাংখ্য ও যোগ।

আরও কয়েকটি তথ্য প্রাসঙ্গিকজ্ঞানে এখানে স্থাপন করছি। খ্রীষ্টীয়ধর্মের প্রবর্তক যীশুর জীবনী পড়লে জানা যায় যে তাঁর জীবনের একযুগেরও বেশী সময় রহস্যাবৃত আছে। এ সম্বন্ধে একটি বহুলপ্রচারিত কিংবদন্তী এই যে তিনি ঐ সময়ে ভারতে এসে যোগের প্রয়োগবিদ্যায় পাঠ নিয়ে যান। তাঁর শিষ্যপ্রশিষ্যদের মধ্যে গুহাহিত অবস্থায় ধ্যানধারণা জপতপ করারও একটি ঐতিহ্য ছিল। ইসলামধর্মের প্রবর্তক হজরত মোহম্মদও যৌবনে বহুবৎসর মরুপ্রান্তরে একাকী দেহজ্ঞানশূন্য অবস্থায় দিব্যভাবে বিভোর হয়ে ঈশ্বরচিন্তা করতেন বলে শোনা যায়। সাধ্বী রাবেয়া সেই সময় তাঁর ঐহিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখলে তাঁর প্রাণরক্ষা করাই অসম্ভব হত। গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরাস সম্পর্কেও যোগ ও ব্রহ্মচর্য, আশ্রমজীবন ইত্যাদিতে পাঠগ্রহণ বিষয়ে লোকপ্রবাদ আছে। এ সব কাহিনীর মূলে সত্য আছে কি না জানা নেই। তবে এ থেকে একটি কথা নিশ্চয় বোঝা যায় যে প্রাচ্যদেশের ধর্ম-সাধনার ব্যাপারে যোগ নামক একটি গুহ্যবিদ্যার কথা দেশে বিদেশে বিশেষ ভাবেই প্রচলিত ছিল এবং সে বিদ্যার সমাদরও কিছু ছিল।

এইসূত্রে আর একটি বিষয়ের উল্লেখও প্রাসঙ্গিক হবে বলেই মনে করি। যোগশাস্ত্রে প্রয়োগবিধি এমনই মুখ্যস্থানে আছে এবং প্রয়োগের উপায় ও সিদ্ধি উভয় প্রসঙ্গেই আপাতদৃষ্টিতে অলৌকিক ভাবনার এতই নিদর্শন পাওয়া যায় যে প্রতীচ্যপণ্ডিতগণ অনেক সময়ই যোগ সম্পর্কে উন্নাসিক অবজ্ঞা বা সন্দেহের ভাব প্রকাশ করেন। ভারতীয় কথাকাহিনীতেও ভোজরাজ, তাল-বেতালসিদ্ধ বিক্রমাদিত্য এমন কি কিঞ্চিৎ অর্বাচীন রাণী ময়নামতী ইত্যাদি সকলকেই যোগসিদ্ধ ঐন্দ্রজালিক ও অলৌকিক ক্ষমতাবান্ বলেই চিত্রিত করা হয়েছে। এমন কি প্রাচীন ভারতীয় রাসায়নিক নাগার্জুনের জ্ঞানকেও 'সিদ্ধাই' বা যোগবিভূতি বলেই প্রচার করা হয়েছে। অতি আধুনিককালে শ্রীঅরবিন্দের অলৌকিক যোগবিভূতি সম্বন্ধেও অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে।

যে কোনও প্রয়োগবিদ্যার মতই যোগও গুরুমুখী বিদ্যা। শাস্ত্রপাঠ ক'রে এর রহস্য সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা যায় না। পরন্তু যাঁরা গুরুর নির্দেশিত পথে চলে এই রহস্য বা গুপ্তবিদ্যা আয়ত্ত করেন তাঁদের ক্ষেত্রেও সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করা না করা নির্ভর করে অপরোক্ষ অনুভূতির উপর। এ অবস্থায় যুক্তির দ্বারা এ

সিদ্ধান্তকে বর্জন করা অসম্ভব। মননশাস্ত্রে এমন সিদ্ধান্তকে সকলেই সন্দেহের চক্ষে দেখেন। কেননা falsification বা মিথ্যা প্রমাণিত হবার পথ খোলা না থাকলে কোনও সিদ্ধান্তকেই যুক্তিসিদ্ধ বলে মানা যায় কি? দার্শনিক দৃষ্টিতে যোগের এই গুরুতর ত্রুটির জন্য আধুনিক মনের কাছে মননশাস্ত্র হিসাবে যোগের মূল্য একটু কমে গেছে। তা সত্ত্বেও যেহেতু ভারতীয় দর্শনচিন্তার সঙ্গে সাধনপ্রণালী হিসাবে যোগ ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে সেইজন্য ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে সম্যক্‌ভাবে পরিচিত হ'তে হ'লে যোগশাস্ত্রে কিঞ্চিৎ অধিকার থাকতেই হবে।

যোগের মূলগ্রন্থ পতঞ্জলির যোগসূত্র। সূত্রকার পতঞ্জলি এবং পাণিনি-ব্যাকরণের মহাভাষ্য রচয়িতা পতঞ্জলি অভিন্ন কি না এ বিষয়ে মতভেদ আছে। যোগসূত্র চতুষ্পাদ। এই চারিটি পাদের নাম সমাধি, সাধন, বিভূতি ও কৈবল্য। এর মধ্যে প্রথম তিনটি পাদ প্রাচীন—সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত। কিন্তু চতুর্থপাদে বৌদ্ধমতের নবীন মতবাদের উল্লেখ আছে বলে পণ্ডিতরা এটিকে অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন বলে মনে করে থাকেন। এই সূত্রের ব্যাসকৃতভাষ্য প্রচলিত আছে। ব্যাস নমটি স্পষ্টতই ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়—ব্যবস্থাপক পণ্ডিতের পদমর্যাদাজ্ঞাপক উপাধি। মহাভারতকার ব্যাসদেবই যোগসূত্রের ভাষ্যকার ব্যাস কি না তা ঠিক জানা যায় না। এই ভাষ্যের একটি বহুলপ্রচলিত টীকা রচনা করেছিলেন সর্বশাস্ত্রপারঙ্গম বাচস্পতি মিশ্র। টীকাটির নাম তত্ত্ববৈশারদী। বিজ্ঞানভিক্ষুও যোগবার্তিক নামে ভাষ্য-টীকা রচনা করেন। ভোজরাজকৃত বৃত্তিও পণ্ডিতসমাজে সমাদৃত।

প্রয়োজন

অন্যান্য সকল (চার্বাক বাদে) প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের মতই যোগ-শাস্ত্রেও সংসারকে পরিহর্তব্য বলেই জ্ঞান করা হয়েছে। সংসার তো রোগ—সকল রোগের বাড়া রোগ। এ থেকে নিরাময় লাভ করতে না পারলে দুঃখের হাত হতে পরিত্রাণ নেই। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে যেমন রোগ, নিদান, আরোগ্য এবং ভেষজের কথা বলা হয় যোগশাস্ত্রে তেমন হেয়, হেয়োৎপত্তি, হান এবং হানোপায়ের কথা বলা হয়েছে। দুঃখই যে হেয় বা পরিহর্তব্য সে বিষয়ে শাস্ত্রপাঠ করে জ্ঞানলাভ করতে হয় না। সহজ বুদ্ধিতেই আমরা বুঝি যে দুঃখই হেয়। তবে দুঃখ কি এবং কোন্ প্রকারের দুঃখ হেয় তা শাস্ত্র হতেই

জানতে হবে। ত্রিগুণা প্রকৃতির পরিণাম এই সংসারে সকলই সুখ, দুঃখ ও বিষাদের আকর। পুরুষ তত্ত্বত নির্লেপ। কিন্তু অবিবেকহেতু প্রকৃতির সঙ্গে আপন তাদাত্ম্য কল্পনা করে তার দুঃখভোগ হয়। তবে অতীত বা বর্তমান দুঃখকে হেয় বলার তো কোনও অর্থ হয় না। যা হয়ে গেছে বা হ'তে শুরু করে দিয়েছে তাকে আমি পরিহার ক'রবো কেমন করে? অতএব একমাত্র অনাগত দুঃখই হেয় হতে পারে। এই হেয়কে পরিহার করার একমাত্র উপায় তার উৎপত্তির মূলটি খুঁজে বার করে তাকে বিনষ্ট করা। যোগশাস্ত্র সেই শিক্ষাই দেয়। সঙ্গে সঙ্গে তাত্ত্বিক বিচারের সাহায্যে এও প্রমাণ করে যে হেয়ের সমূল এবং নির্বীজ বিনাশ বা হান সম্ভব এবং তার উপায়ও আছে। সূত্রকার বলেছেন যে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগই হেয়হেতু। এখানে 'দ্রষ্টা' 'দৃশ্য' ও 'সংযোগ' এই তিনটি শব্দই ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে দ্রষ্টা ধর্মী এবং চৈতন্য তার ধর্ম এরকম চিন্তা ভ্রমাত্মক বলেই যোগশাস্ত্রে গণ্য হবে। কেননা চিৎও যা দ্রষ্টাও তাই। তবে যতক্ষণ দৃশ্য আছে ততক্ষণই দ্রষ্টা। দৃশ্য না থাকলে 'চিতিশক্তি' 'চৈতন্য' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা উচিত। দ্রষ্টাকে চিদ্রূপ বলা হয়। সাংখ্যপাতঞ্জলশাস্ত্রে বুদ্ধিকে দৃশ্য ও পুরুষকে জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা বলা হয়। এই বুদ্ধি ও পুরুষে ভেদ অতি সূক্ষ্ম এবং অবিবেকবশত আমরা এদের ভেদ প্রায়শই বুঝতে পারি না। মনে রাখতে হবে যে বুদ্ধি পরিণামী। কেননা বুদ্ধির বিষয় জ্ঞাত ও অজ্ঞাত উভয়ই। কিন্তু পুরুষ অপরিণামী। কেননা পুরুষাকারা বুদ্ধি কেবল 'আমি জ্ঞাতা' এই প্রকারেরই হয়—'আমি অজ্ঞাতা' এই আকারের হয় না। সুতরাং প্রকৃত জ্ঞাতা অর্থাৎ দ্রষ্টা পুরুষ নির্বিকার। বিশদ করে বললে এই দাঁড়ায় যে যে কোনও বিষয়ের বুদ্ধি প্রথমে অজ্ঞানান্ধকারে থাকে—বিষয়টি সেকালে অজ্ঞাত। যখন জ্ঞান হয় তখন বুদ্ধি ঐ বিষয়াকারে আকারিত হয়ে চৈতন্যালোকে উদ্ভাসিত হয়। বিষয়টি তখন জ্ঞাত। এই জন্যই প্রমার লক্ষণে অজ্ঞাতার্থজ্ঞাপকত্বর কথা বলা হয়েছে। এইরকম অবস্থাভেদ স্বীকার করার অর্থ হল বুদ্ধির পরিণাম স্বীকার করা। কিন্তু পুরুষ সদা প্রকাশস্বরূপ। এই প্রকাশ সর্ববিষয়ক কিন্তু বৃত্তিবিরহিত। এই সদাপ্রকাশরূপতাই পুরুষের অপরিণামিত্ব সিদ্ধ করে। আরও, বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি নানাশক্তির সাহায্যে সুখ-দুঃখরূপ ফল উৎপাদন করে। কিন্তু সে ফলের চরম জ্ঞাতা বা ভোক্তা বুদ্ধি নয়। সেই ভোক্তা বুদ্ধির অতিরিক্ত পুরুষ। সুতরাং বুদ্ধি পরার্থ। কিন্তু

পুরুষ বা দ্রষ্টা নিজেই বিষয়ী—প্রকৃতি (বুদ্ধি) তার বিষয়। সুতরাং পুরুষ স্বার্থপ্রকাশ। বুদ্ধি অচেতন—এই কথাটির মর্মার্থ গ্রহণ করা সব থেকে কঠিন। কিন্তু বিবেচনা করুন—যা কিছু পরিণামী তাতে ক্রিয়া, প্রকাশ ও অপ্রকাশ এই ত্রিগুণ থাকে। সুতরাং তা দ্রষ্টার দৃষ্টিতে দৃশ্য এবং দৃশ্য তো স্বপ্রকাশ নয়। আর যা স্বপ্রকাশ নয় তাই অচেতন। পুরুষ ত্রিগুণাতীত দ্রষ্টা, সুতরাং সে নিত্যচেতন স্বপ্রকাশ। কিন্তু পুরুষের সঙ্গে বুদ্ধির অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে কেননা পুরুষ বুদ্ধিকে উপদর্শন করেন। বুদ্ধি যদি সংবেদন হয় তো পুরুষ প্রতিসংবেত্তা। এই প্রতিসংবেত্তা পুরুষ স্ববোধে প্রত্যগাত্মারূপে ভাসিত হ'ন। কিন্তু জ্ঞানকালে বুদ্ধির পরিণামী অংশ এবং পুরুষের উপদৃষ্টি অভিন্নরূপে অবভাত হয়—অর্থাৎ 'আমি জানছি' এবং 'আমার জানা (বা বুদ্ধি) দৃষ্ট হচ্ছে এমন দ্রষ্টার দৃষ্টিতে যিনি স্বপ্রকাশ' এরকম পৃথক্ পৃথক্ বোধ জ্ঞানকালে আমাদের হয় না। জ্ঞানপ্রবাহ নিয়তই চলছে। সুতরাং পুরুষ ও জ্ঞানরূপা বুদ্ধির অভেদ প্রত্যয় বা অবিবেক অবভাস নিয়তই চলছে। এইটি বুঝলেই সূত্রকার দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের সংযোগ বলতে কী বুঝিয়েছেন তা বোঝা যাবে। দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগ যে আছে তা একটি তথ্য। কারণ—'আমি শরীর ইন্দ্রিয়াদি জ্ঞেয়' ও 'আমি জ্ঞাতা' আমাদের এই দুই আকারেরই প্রত্যয় হয়। সুতরাং 'অহংতা' বা 'আমিত্ব'ই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সংযোগস্থল। এই সংযোগ বলতে ঠিক কি বোঝায়? যখন একাধিক পৃথক্ বস্তুকে অপৃথক্ বা অবিরল বলে বোধ হয় তখন তারা সংযুক্ত এরকম বলা হয়। সংযোগ (ক) 'দৈশিক', (খ) 'কালিক', বা (গ) 'অদেশকালিক' এই তিন রকম হতে পারে। দুইটি বস্তু যদি দেশে অব্যবহিত হয়ে থাকে তবে তাদের সংযোগ দৈশিক যেমন ভূতলে ঘট। মন, মানসিক ভাব ইত্যাদি যে সকল বস্তুর কেবল কালিক সত্তা তাদের সংযোগ কালিক। যেমন বিজ্ঞানের সঙ্গে সুখাদি বেদনার সংযোগ। একই কালে চিত্তে বিজ্ঞান ও সুখ দুই ধর্ম উদিত হতে পারে না। অথচ 'সুখকর বিজ্ঞান হ'ল' এমন বোধ তো আমাদের প্রায়শই হয়। যেমন মিষ্ট-ফল আস্বাদন করলে যে সুখকর বিজ্ঞান হয় তাকে বিশ্লেষণ করলে দেখি যে প্রথমে মিষ্টফলটির বোধ হয়—তারপর সুখবোধ হয়। এই স্থলে দুটি বৃত্তি স্বীকার করতে হবে—একটি বিষয়াকারা বৃত্তি—আর অন্যটি সুখকারা বৃত্তি। এই দুই বৃত্তি এককালে হওয়া অসম্ভব। সুতরাং স্বীকার করতে হবে যে নিশ্চয় একটি আগে এবং একটি পরে হয়েছে। কিন্তু তাদের এই কালিক ব্যবধান

আমরা লক্ষ্যই করি না। যারা দেশকালাতীত সত্তা যেমন মূল দ্রষ্টা ও মূল দৃশ্য তাদের যে সংযুক্ত বলে বোধ হয় তা অদেশকালিক সংযুক্তি। তবে অসংযুক্ত তত্ত্বের সংযোগের বোধ বিপর্যাসমাত্র। মূল দ্রষ্টা স্থানকালব্যাপী হতে পারে না। কেননা সাংখ্য-পাতঞ্জলমতে দেশ ও কাল প্রকৃতিরই স্বরূপ। মূলদ্রষ্টা বা দৃক্ অতি অবশ্য দেশকালাতীত পদার্থ। মূল দৃশ্যও নিত্যপরিণাম-মাত্র—পরিণামী ধর্মী নয়। সুতরাং মূলদৃশ্যও কালাতীত সত্তা। এই দেশ-কালাতীত দ্রষ্টা ও দৃশ্য পৃথক্ অথচ তাদের অপৃথক জ্ঞান করা হ'ল বিপর্যয়। সুতরাং অবিদ্যাই এই দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগের মূল। এই সংযোগের বোধ কার হয়? আমিই এর বোদ্ধা। কারণ আমিই মনে করি যে 'আমি শরীরাদি'—'আমি জ্ঞাতা'। এখন আশঙ্কা হয় যে 'আমি' তো ঐ সংযোগের ফল তাহ'লে আমি কিরকম করে ঐ সংযোগের বোদ্ধা হব? উত্তরে বলা যায় যে সংযোগ হয়ে গেলে 'আমি' হই এবং আমিই তখন তা বুঝতে পারি—এরমধ্যে আশ্চর্য হবার তো কিছু নেই। ঐ সংযোগরূপ অবিবেকের বিরুদ্ধভাব হচ্ছে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের পৃথক্ত্ববোধ বা বিবেকজ্ঞান। পুরুষ এই সংযোগ ও বিয়োগ উভয়েরই সাক্ষী। সংযুক্ত থাকলে বা সংযুক্ত বলে মনে হ'লে বস্তুদের গুণের অনেক পরিবর্তন লক্ষিত হয়। এইজন্যই দ্রষ্টা ও দৃশ্যকে সংযুক্ত মনে করলে দ্রষ্টাকে দৃশ্যের মত ও দৃশ্যকে দ্রষ্টার মত দেখায়। এইভাবেই বুদ্ধিকে চেতন বলে ভ্রম হয় এবং আমি ও আমিত্ব হতে জাত প্রপঞ্চের সৃষ্টি হয়। দৃশ্যের মূলরূপ অব্যক্ত। দ্রষ্টার দ্বারা দৃষ্ট না হলে দৃশ্য অব্যক্তই থাকে। এইজন্যই দৃশ্য স্বতন্ত্র হয়েও অন্যাধীন, পরার্থ। পুরুষ কিন্তু জ্ঞরূপে চিতিশক্তি-রূপে চিত্তবৃত্তির সাক্ষী—সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বপ্রকাশ।

দৃক্‌দৃশ্যের সংযোগরূপ অবিবেকই যখন হেয়োৎপত্তির কারণ তখন প্রকৃতি হতে পুরুষের বিবেকখ্যাতিই হানের উপায়। প্রকৃতিপুরুষে অবিবেক বুদ্ধির ক্ষেত্রেই লক্ষিত হয়। বুদ্ধি যেহেতু প্রকৃতির সত্ত্বগুণপ্রধান বিকৃতি সুতরাং দ্রষ্টা পুরুষ সেই স্বচ্ছবুদ্ধিতে যখন প্রতিফলিত হয় বুদ্ধি যেন চেতনায়-মান হয়ে ওঠে। বুদ্ধির সঙ্গে অনুস্যূত অহঙ্কার তখন 'আমি জানছি' 'আমি করছি' ইত্যাকার ধারণ করে এবং সকল প্রকার সাংসারিক সুখদুঃখের উৎপত্তির মূল হয়ে দাঁড়ায়। অতএব এই চঞ্চল মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারকে বশীভূত এবং স্থির না করতে পারলে জড়া বুদ্ধি থেকে দ্রষ্টা পুরুষকে বিবিক্ত করা যাবে না। এইজন্যই যোগী সর্বতোভাবে চিত্তবৃত্তিগুলিকে নিরুদ্ধ করবার প্রয়াস

করেন। সাধারণ্যে একটি ভ্রান্তধারণা প্রচলিত আছে যে যোগী ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হবার সাধনা করেন। কিন্তু যোগীর লক্ষ্য ঈশ্বরপ্রাপ্তি নয়। তাঁর লক্ষ্য আত্মার স্বরূপ জেনে তাতেই অবস্থান করা। সংক্ষেপে যোগশাস্ত্রের প্রয়োজন ও লক্ষ্য এই।

সমাধিপাদ

চিত্তবৃত্তি, চিত্তভূমি ও বৃত্তিনিরোধ

সূত্রকার যোগের লক্ষণ দিয়েছেন—যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ। সুতরাং প্রথমেই চিত্ত কি, বৃত্তি কি, তার নিরোধই বা কি ও তা কেমন করে করা যায় এই প্রশ্নগুলির উত্তর চাই। পাতঞ্জল দর্শনে প্রকৃতির কতকগুলি বিকার একত্রে চিত্ত শব্দের অভিধেয় বলে গণ্য হয়। এই বিকারগুলি হ'ল মন, বুদ্ধি, এবং অহঙ্কার। চিত্তের সহজ বা স্বাভাবিক অবস্থাকে বলা হয় চিত্তভূমি। এই ভূমি পাঁচ প্রকার—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র, নিরুদ্ধ।

যে চিত্ত অস্থির, চঞ্চল, অতীন্দ্রিয় বিষয়ে চিন্তা করার মত স্থৈর্য বা ধীশক্তি যার নেই সেই চিত্তই ক্ষিপ্তভূমিক। ক্ষিপ্ত চিত্তের কাছে তত্ত্বগুলি (অর্থাৎ পুরুষ, প্রকৃতি, ঈশ্বরাদি) অচিন্ত্য বলে মনে হয়। সংসারে অধিকাংশ চিত্তের অবস্থাই এই।

যে চিত্ত ইন্দ্রিয়বিষয়ে এতই মুগ্ধ যে সে তত্ত্বচিন্তায় অক্ষম সে মূঢ়ভূমিক।

বিক্ষিপ্ত চিত্তের সঙ্গে ক্ষিপ্তের ভেদ এই যে ক্ষিপ্ত সদাই অস্থির, চঞ্চল। বিক্ষিপ্ত কিন্তু সময়ে সময়ে স্থির সময়ে সময়ে চঞ্চল। ক্ষিপ্ত ও মূঢ় চিত্ত তত্ত্ব-চিন্তায় অক্ষম। তাদের সমাধি হতেই পারে না। কিন্তু বিক্ষিপ্ত চিত্ত মাঝে মাঝে অল্পক্ষণের জন্য সমাহিত হলেও হতে পারে।

যে চিত্তের অগ্র বা অবলম্বন এক তাই একাগ্র চিত্ত। সাংখ্যপাতঞ্জলমতে বিষয়ের সান্নিধ্যে গমন করে চিত্ত বিষয়াকারে আকারিত হয়। একেই চিত্তের বৃত্তি বলা হয়। একটি বৃত্তি লয় পাবার পর যদি পুনরায় সেই বিষয়াকারে বৃত্তিই ওঠে এবং পরম্পরাক্রমে এইভাবে একই বিষয়াকারে বৃত্তি দীর্ঘকাল ধরে থাকে তাহলে বলা হয় চিত্ত একাগ্র হয়েছে। এই অবস্থায় সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়।

শেষে যখন অভ্যাসদ্বারা চিত্তের সকল বৃত্তিই নিরুদ্ধ করে চিত্তকে সম্পূর্ণ স্থির রাখা হয় তখন চিত্তের নিরুদ্ধভূমিক অবস্থা হয়। এই নিরুদ্ধভূমিতে

অবস্থিত চিত্তই কৈবল্যলাভে সক্ষম হয়; নিরুদ্ধভূমিক সমাধির নাম অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি।

সকল জীবের চিত্তই স্থূলত এই পাঁচ অবস্থায় অবস্থিত থাকে। সম্প্রজ্ঞাত এবং অসম্প্রজ্ঞাত উভয়প্রকার সমাধিকেই যোগ বলা হয়। প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও স্থিতিশীলত্ব চিত্তের এই তিন স্বভাব আছে বলে যোগশাস্ত্রে চিত্তকে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক বলে মনে করা হয়। যখন চিত্তে আর লেশমাত্রও অস্থৈর্যরূপ রজোগুণের মল থাকে না তখন চিত্ত স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হয়ে কেবলমাত্র বুদ্ধি ও পুরুষের ভিন্নতাখ্যাতিযুক্ত হয়ে ধ্যানোপগত হয়। এই বিবেকখ্যাতিকে যোগশাস্ত্রে পরমপ্রসংখ্যান নামে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে চিতিশক্তি বা দৃক্ বা দ্রষ্টা পুরুষ পরিণামরহিত, নিষ্ক্রিয়, নির্লিপ্ত, শুদ্ধ (অর্থাৎ সাত্ত্বিক প্রকাশের মত চলনশীল ও আবরণশীল নয়) এবং অনন্ত (অর্থাৎ অন্ত পদার্থের সহিত সংযোগরহিত)। অতএব সত্ত্বগুণপ্রধান পরমপ্রসংখ্যান বা বিবেকবুদ্ধিও যোগীর শেষ লক্ষ্য হতে পারে না। এই বিবেকখ্যাতিতেও যখন বৈরাগ্য জন্মায় তখনই কেবল অসম্প্রজ্ঞাত নিরুদ্ধ নির্বীজ সমাধি সম্ভব হয়।

বুদ্ধির প্রকাশ ও চিতিশক্তির প্রকাশের ভেদ এই যে চিতিশক্তি স্বপ্রকাশ, বুদ্ধির প্রকাশ কিন্তু প্রকাশক পুরুষের যোগেই সম্ভব হয়। তাছাড়াও বুদ্ধির প্রকাশ সাধারণত রজো ও তমোগুণের দ্বারা অল্লাধিক আবৃত ও চঞ্চল। এইজন্যই বুদ্ধির প্রকাশ্য বিষয়ও পরিচ্ছিন্ন নশ্বর চঞ্চল। বিপরীতদিকে চিতিশক্তির প্রকাশ স্থির, অনাবৃত, অবিনশ্বর, স্বপ্রকাশ। বুদ্ধি চিতিশক্তির দৃশ্য। কেননা বুদ্ধির প্রকাশের জন্য চিতিশক্তির অপেক্ষা থাকে। কিন্তু চিতিশক্তি কারও দৃশ্য নয়। প্রথমে সম্প্রজ্ঞাতসমাধি হয়ে সত্ত্বগুণপ্রধান বুদ্ধির আলোকে ধ্যেয় বিষয়ের প্রকৃষ্ট, সর্বতোমুখী ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞান হয়। পরে পরবৈরাগ্যপূর্বক এই জ্ঞানবৃত্তিকেও নিরুদ্ধ করে যখন স্বপ্রকাশ চিৎ বা দ্রষ্টার আলোকে আবুদ্ধি সমস্তই প্রকাশিত হয় তখনই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি না হ'লে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হতে পারে না। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থায় ক্লেশসকল ক্ষীণ হয় ও কর্মবন্ধন মুক্ত হয়। এখন প্রশ্ন হ'ল যাকে নিরুদ্ধ করতে হবে সেই চিত্তবৃত্তি বলতে কি বোঝায়? পাতঞ্জল মতে চিত্তের পাঁচ প্রকার বৃত্তি হতে পারে। যার দ্বারা যা বর্তমান বা জীবিত থাকে তাই তার বৃত্তি—যেমন ব্রাহ্মণের যাজনাদি। চিত্তের বৃত্তি হল জ্ঞানরূপ অবস্থা-

সকল। যোগের ভাষায় পুরুষের দ্বারায় পরিদৃষ্ট চিত্তভাব বা বোধকেই বৃত্তি বলা হয়েছে। এই অবস্থাগুলির অভাবে চিত্ত লীন হয়ে যায় তাই তাদের নাম চিত্তবৃত্তি। সৎকার্যবাদী সাংখ্য-পাতঞ্জল দর্শনে 'লীন হওয়া'র অর্থ এইরূপ—বস্তুগুলি তাদের কারণেরই ব্যক্তরূপমাত্র। কার্যে কারণাতিরিক্ত নূতন কিছু থাকতে পারে না। ঐ কার্যগুলি বিপরীতক্রমে যখন তাদের প্রকৃতি বা কারণে প্রত্যাবর্তন করে (যেমন স্বর্ণালঙ্কারগুলি স্বর্ণপিণ্ডে) তখন আমরা বলি তাদের 'নাশ' হ'ল বা তারা লীন হয়ে গেল। যখন বিবেকখ্যাতি হয়ে পুরুষপ্রকৃতি সংযোগের নাশ হয় তখন চিত্ত মূল প্রকৃতিতে লীন হয়ে থাকে।

যোগশাস্ত্রে পাঁচটি বৃত্তির উল্লেখ পাই—যথা (ক) প্রমাণ (খ) বিপর্যয় (গ) বিকল্প (ঘ) নিদ্রা (ঙ) স্মৃতি। এর প্রত্যেকটিই ক্লিষ্ট বা অক্লিষ্ট হতে পারে।

(ক) প্রমাণ বলতে যোগে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম এই তিনটিকে স্বীকার করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষ প্রধানত বিশেষ বিষয়ক কিন্তু অনুমান এবং আগমপ্রমাণের বিষয় সামান্য। 'বিশেষ' বলতে কি বুঝবো? এ প্রসঙ্গে দুটি শব্দের অর্থ জানা প্রয়োজন—'মূর্তি' ও 'ব্যবধি'। প্রত্যেক বস্তুর অন্য সব বস্তুর থেকে পৃথক্ যে শব্দস্পর্শরূপাদিগুণ তাই তার মূর্তি। আর 'ব্যবধি' অর্থে আকার। এখন, যে কোনও একটি বস্তু যেমন একখানি পুস্তককে যদি দৃষ্টান্ত হিসাবে নেওয়া যায় তাহলে দেখি যে তার মূর্তি এবং আকার শত শত শব্দের সাহায্যেও যথাযথ প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু স্বচক্ষে দেখলে তৎক্ষণাৎ তার জ্ঞান হয়। এইজন্যই অন্ধকে রঙের বর্ণনা দিয়ে রঙের জ্ঞান বা বধিরকে শব্দের বর্ণনা দিয়ে শব্দের জ্ঞান দেওয়া যায় না। এইজন্যই বলা হয়েছে যে প্রত্যক্ষ প্রধানত বিশেষবিষয়ক। প্রত্যক্ষে অবশ্য সামান্যজ্ঞান একেবারেই থাকে না এমন বলা যায় না—কিন্তু প্রাধান্য থাকে বিশেষজ্ঞানের। অনুমান এবং আগমপ্রমাণে ঠিক এর বিপরীত। অর্থাৎ সেখানে জ্ঞানের বিষয় সামান্যমাত্র। প্রত্যক্ষে প্রথমত দ্রষ্টা ও দৃশ্যের পৃথক্ উপলব্ধি হয় না। ন্যায়-মতে ঘটের প্রত্যক্ষকালে 'ঘট আছে' এই রকমই উপলব্ধি হয়। অবশ্য অনু-ব্যবসায়রূপ প্রত্যক্ষকালে 'আমি' 'ঘট' 'দেখছি' এইভাবে জ্ঞেয় জ্ঞাতা ও জ্ঞান তিনের উপলব্ধি হয়। কিন্তু যোগমতে জ্ঞান অর্থে চিত্তবৃত্তি—এবং এই চিত্ত-বৃত্তি উৎপত্তিকালেই পুরুষের আলোকে উদ্ভাসিত। সুতরাং প্রত্যক্ষে জ্ঞাতা জ্ঞেয় জ্ঞান তিনই প্রকাশিত হয়। এখন প্রশ্ন উঠবে যে চিত্তের তো নানা

বৃত্তি হয়—তবে কি চিত্ত এক নয়, নানা? আরও আশঙ্কা হয় যে দ্রষ্টা পুরুষ যখন এই নানাবৃত্তির প্রকাশক তখন বিষয়ের নানাত্ব কি পুরুষেও নানাত্ব বা পরিণাম আনে? যোগে এর উত্তরে বলা হয়েছে যে নানাত্ব থাকে ইন্দ্রিয়ে ও অন্তঃকরণে।

প্রত্যক্ষপ্রমাণের আলোচনাকালে প্রাসঙ্গিকভাবে অনুমানপ্রমাণ সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হ'ল তার বেশী আলোচনা বিশেষ ফলপ্রসূ হবে না বিবেচনায় এ বিষয়ে আর কিছু বললাম না। অনুমানপ্রমাণের বিশদ আলোচনার জন্য ন্যায় ও সাংখ্যশাস্ত্র অধ্যয়ন অবশ্যকর্তব্য। আপ্ত বা যথার্থবক্তা পুরুষ যখন দৃষ্ট বা অনুমিত বিষয়ে বাক্য উচ্চারণ করেন তখন সেই শব্দের অর্থবিষয়ে শ্রোতার চিত্তে যে বৃত্তি উৎপন্ন হয় তাই শ্রোতার আগম-প্রমাণ।

ইন্দ্রিয়াদির দোষ ঘটলে প্রত্যক্ষের দোষ হয়। সাধ্য-হেতু-সম্বন্ধ-জ্ঞানের দোষ ঘটলে অনুমানের দোষ হয় এবং আগমের বক্তা যদি অজ্ঞ বা প্রবঞ্চক হয় তবে আগমও দুষ্ট হয়।

বিপর্যয় নামক দ্বিতীয় চিত্তবৃত্তি হচ্ছে যে কোনওরকম ভ্রান্তজ্ঞান। অবশ্য যোগীরা যে সমস্ত বিপর্যয় বা ভ্রান্তজ্ঞানকে দুঃখের মূল স্থির করে নিরোদ্ধব্য বলেছেন তারা পঞ্চ ক্লেশরূপ বিপর্যয় যথা—(ক) অবিদ্যা (খ) অস্মিতা (গ) রাগ (ঘ) দ্বেষ (ঙ) অভিনিবেশ। এই ক্লেশগুলির বিষয়ে যথাস্থানে বিশদ আলোচনা করা হবে।

তৃতীয় চিত্তবৃত্তি বিকল্পের বিষয়ে সূত্রকার বলেছেন—শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ। অর্থাৎ বিকল্প একপ্রকার জ্ঞান যার বিষয় অবস্তু—অথচ শব্দজ্ঞানের মাহাত্ম্যে বিকল্প হতে বাক্য ব্যবহার হয়। অনেক শব্দ বা বাক্য আছে যাদের অভিধেয়ের বাস্তব কোনও সত্তা নেই। অথচ ঐসব শব্দ বা বাক্য শুনলে একপ্রকার অস্ফুট জ্ঞানবৃত্তি আমাদের চিত্তে হয়। ঐ বৃত্তিগুলিই বিকল্পবৃত্তি। বিকল্প তিন প্রকার হতে পারে—বস্তু-বিকল্প, ক্রিয়া-বিকল্প ও অভাব-বিকল্প। বস্তু-বিকল্পের দৃষ্টান্ত—রাহুর শির, পুরুষের চৈতন্য ইত্যাদি। রাহু ও তার শির দুই নয় এক। সুতরাং এখানে ভেদরচনাকল্পে সম্বন্ধে ষষ্ঠীর ব্যবহার বৈকল্পিক। চৈতন্য ও পুরুষের সম্বন্ধেও ঐ একই বক্তব্য। ক্রিয়া-বিকল্প যেমন যখন বলা হয় 'লোকটি না নড়ে স্থির হয়ে আছে।' এই 'স্থির হয়ে থাকা' বা 'না নড়া' তো কোনও ক্রিয়া নয়। অথচ যেন সে একটি ক্রিয়া

করছে এইরকম বোধক একটি বাক্যের এখানে বৈকল্পিক ব্যবহার হয়েছে। অভাববিকল্পের দৃষ্টান্ত—যখন বলা হয় 'পুরুষ উৎপত্তি ধর্ম শূন্য'। শূন্যতা বা অভাব অধিকরণ স্বরূপ। তার তো কোনও পৃথক সত্তা নাই। সুতরাং ঐ বাক্যটি ব্যবহার করলে শ্রোতার চিত্তের একটি বৈকল্পিক বৃত্তি ঘটে। কিঞ্চিৎ বিবেচনা করলে অবশ্য ক্রিয়া-বিকল্প ও অভাব বিকল্প একই বলে প্রতিভাত হবে। যেমন 'লোকটি স্থির'—এর অর্থ হল তার গতির অভাব আছে। যোগমতে অভাব অধিকরণস্বরূপ। সুতরাং লোকটি ও তার গতির অভাব অভিন্ন। অথচ লোকটির সঙ্গে তার গতির অভাব বা স্থিরতার ধর্মধর্মী সম্বন্ধ বুঝিয়ে বাক্যটি বলা হয়েছে। যেখানে কেবল এক আছে দুই নেই সেখানে সম্বন্ধও থাকতে পারে না। অতএব এস্থলে অবাস্তব সম্বন্ধের একটি বৈকল্পিক আকার দেখছি। আবার 'পুরুষ উৎপত্তি ধর্ম শূন্য' স্থলেও পুরুষের সঙ্গে উৎপত্তি ধর্মের অভাবের অভেদই যোগমতে স্বীকৃত। অথচ বাক্যটিতে পুরুষের সঙ্গে উৎপত্তি ধর্মশূন্যতার ধর্মধর্মীভাব বোঝানো হয়েছে। অতএব বিকল্প দুই প্রকারের স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত—বস্তুবিকল্প ও অভাববিকল্প।

এই বিকল্প বৃত্তির স্বীকৃতি দ্বারা যোগদর্শনে ভাষা ব্যবহার এবং প্রসঙ্গত মানুষের চিত্তের ক্ষমতা বিষয়ে একটি মূল্যবান সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। বিষয় হ'তে স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে কল্পনা করবার স্বাধীনতা মানবমন বা চিত্তের আছে কি নেই এ নিয়ে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয়প্রকার দর্শনেই বিভিন্ন মতপ্রকাশ করা হয়েছে। প্রাচ্যে উদয়ন ও প্রতীচ্যে রাসেল এক বিশেষ কৌশল প্রয়োগ করে অবস্তুর জ্ঞানকে বস্তুর জ্ঞানরূপে দেখিয়েছেন। অবস্তুকে তাঁরা জ্ঞানের বিষয়রূপে স্বীকার করেননি। যোগশাস্ত্র সম্মত বিকল্পকেও তাঁরা সদ্‌বিষয়ক জ্ঞান বলেই মনে করবেন। কিন্তু পাশ্চাত্যের existentialist দর্শনে যেমন যোগশাস্ত্রেও তেমন চিত্তের intention বা বিকল্প বৃত্তিকে যথেষ্ট প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। নচেৎ তাঁরা বস্তুশূন্য অথচ শব্দজ্ঞানানুপাতী এই বিকল্পবৃত্তির কথা বলতেন না। অথচ সাংখ্যের মত যোগও জ্ঞানবিষয়ে বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদই (realism) সমর্থন করেন। বিপর্যয় বা ভ্রমের থেকে বিকল্পের ভেদ এই যে বিপর্যয় দ্বারা ব্যবহার বা ভাব বিনিময় সিদ্ধ হয় না কিন্তু বিকল্পের দ্বারা ব্যবহার সিদ্ধ হয়। আরও বিকল্প বাধিত হয় না, বিপর্যয় বিপরীত নিশ্চয় দ্বারা বাধিত হয়।

চতুর্থ চিত্তবৃত্তি নিদ্রা। নিদ্রাকে সূত্রকার অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তি বলেছেন। এখানে পূর্বপক্ষ আশঙ্কা করতে পারেন যে চিত্তবৃত্তি মাত্রই কোনও

না কোনও প্রকার প্রত্যয়। অথচ নিদ্রা তো প্রত্যয়ের অভাব। তবে নিদ্রাকে চিত্তবৃত্তি বলবো কেমন করে? এর উত্তরে সূত্রের ভাষ্যকার বলেন যে নিদ্রাকালে যদি কোনও প্রত্যয়ই না থাকত তবে নিদ্রাভঙ্গ হলে নিদ্রাকালীন তামসভাবের স্মরণ হ'ত কেমন করে? স্মৃতি বিষয়ে এই নিয়ম যে যে বিষয়ের অনুভব হয়েছে কেবলমাত্র সে বিষয়েরই স্মৃতিজ্ঞান সম্ভব। অননুভূত বিষয়ের স্মৃতি হতে পারে না। নিদ্রার পূর্বে শরীরের যে আচ্ছন্নভাব বোধ হয় তাই তমঃ। সেই তমোগুণই গাঢ়তর হয়ে নিদ্রায় পর্যবসিত হয়। এই তমোগুণের ফলে সকল বিষয় সম্পর্কে আমাদের প্রত্যয়াভাব ঘটে। এই অভাব বা তমঃ যে বৃত্তির বিষয়ীভূত চিত্তের সেই বৃত্তির নামই নিদ্রা। আশঙ্কা করা যায় যে সমাধিকালে নিরুদ্ধ অবস্থায় তো যোগী বাহ্যপ্রত্যয়হীনই থাকেন। তবে কি নিদ্রিত ব্যক্তিকে সমাধিস্থ বলবো? এর উত্তরে বলা হয় যে নিদ্রা অবশ ও অস্বচ্ছ, অপিচ সমাধি স্ববশ ও স্বচ্ছ স্থিরভাব। সমাধিকালে সকল চিত্তবৃত্তির মত নিদ্রাও যোগীর নিরোদ্ধব্য। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—'যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।'

পঞ্চম চিত্তবৃত্তি স্মৃতি। সূত্রকার বলেছেন অনুভূত বিষয়ের অসম্প্রমোষ স্মৃতি। অসম্প্রমোষ শব্দটির অর্থ নিজস্বমাত্র গ্রহণ, পরস্বের অগ্রহণ। যা অনুভূত হয় তদনুরূপ সংস্কার উৎপন্ন হয়—জ্ঞানের এই স্বাভাবিক নিয়ম। এই সংস্কার পরে কোনও সময় উদ্বুদ্ধ হলে তার প্রত্যয়কেই স্মৃতি বলা হয়। যেমন আজ এই বইটি দেখলাম। কাল এটির সম্বন্ধে কোনও আলোচনা হচ্ছে শুনে আমার পূর্বসংস্কার উদ্বুদ্ধ হ'ল এবং আমার ইত্যাকার স্মৃতি হল যে এই সেই বইটি যেটি আমি গতকাল দেখেছিলাম। যখন অনুভব হয় তখন গ্রাহ্য বিষয়টিরই প্রাধান্য থাকে। অর্থাৎ বইটিই প্রধানতঃ অনুভূত হয়। 'আমি বইটি জানছি' এই প্রত্যয়টি অনুস্যূত থাকলেও সে বিষয়ে আমরা সর্বদা অবহিত থাকি না। অর্থাৎ গ্রহণটি গ্রাহ্যের তুলনায় গৌণ থাকে। স্মৃতিজ্ঞানও প্রধানত গ্রাহ্যবিষয়কযদিও গ্রহণকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা এক্ষেত্রেও করা হয় না।

এখন প্রশ্ন হ'ল এই চিত্তবৃত্তিগুলির নিরোধ কী করে করা যাবে? সূত্রকার এ ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছেন—অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা। বৈরাগ্য দু'প্রকার—বশীকার বা অপর ও পর বা ধর্মমেঘ। ভোগের বিষয়গুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—(ক) দৃষ্ট অর্থাৎ যা সাধারণ লৌকিক অভিজ্ঞতায় গম্য। (খ) আনুশ্রবিক অর্থাৎ শ্রুতির উপর আস্থার ফলে যে বিষয়গুলির সম্বন্ধে

আমাদের জ্ঞান ও আকর্ষণ হয়। দৃষ্ট বিষয় যথা অন্ন, পান, বস্ত্র, শয্যা, গৃহ, রথাদি। আনুশ্রবিক বিষয় যথা স্বর্গ, প্রকৃতিলয়, বিদেহলয় ইত্যাদি।

এই সকল বিষয় যখন আমাদের আয়ত্তে আসে তখনও যদি তত্ত্বজ্ঞানের ফলে আমরা তাদের দোষ দেখে তাদের প্রতি বিরক্ত বা নিরাসক্ত হয়ে থাকতে পারি তবে আমাদের চিত্তে বশীকার বৈরাগ্য হয়েছে বলে বোঝা যাবে। এই বিষয়গুলি আপাতমনোরম হ'লেও এরা ত্রিতাপের আকার। এই ত্রিতাপ হ'ল—(ক) তাপ দুঃখ, (খ) পরিণাম দুঃখ ও (গ) সংস্কার দুঃখ। সংসারে ভোগসুখ সর্বদাই অপরের ঈর্ষাদ্বেষের কারণ হয়। তজ্জনিত যে দুঃখ তাকে বলা হয় তাপদুঃখ। যে কোনও ভোগ্যবস্তুরই ক্ষয় আছে—পরিণাম আছে। তজ্জনিত দুঃখই পরিণাম দুঃখ। অনিত্য ভোগ্যবস্তু ভোগজন্য সংস্কার বার বার প্রবৃত্তির উদ্রেক করে এবং বার বার অনিত্য বস্তুলাভের চেষ্টায় প্রযোজিত করে। এই হ'ল সংস্কার দুঃখ। যোগীর দৃষ্টিতে সকল ভোগ্যবস্তুই এই ত্রিতাপের আকর। সুতরাং তিনি বিষয়ে নির্লিপ্ত হতে পারেন। তবে এও বিবেচ্য যে রাগ যেহেতু অন্তঃকরণের ধর্ম বৈরাগ্যও তাই হতে বাধ্য। রাগবশত প্রবৃত্তি এবং বৈরাগ্যে নিবৃত্তি হয়।

পরবৈরাগ্য আরও উচ্চস্তরের অবস্থা। যে বুদ্ধির দ্বারা পুরুষতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হয় তাকে অগ্র্যা বুদ্ধি বা চরম জ্ঞান বলে। পুরুষ সাক্ষাৎকার হলে ত্রিগুণাপ্রকৃতি থেকে পুরুষের বিবেকখ্যাতি হয় এবং আনুষঙ্গিকভাবে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটে। পরবৈরাগ্যের ফলও দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি। সুতরাং পরবৈরাগ্য এবং নিরুপপ্লবা পুরুষখ্যাতি বা চরমজ্ঞান নিত্যসহচর—অবিনাভাবী। পরবৈরাগ্যে প্রবৃত্তির আত্যন্তিক নাশ হয়। প্রবৃত্তিহীন অথচ জাড্যহীন চিত্তাবস্থাকে শুদ্ধজ্ঞানই বলা উচিত। কিন্তু পর-বৈরাগ্যে খ্যাতি বা জ্ঞানবিষয়েও বৈরাগ্য দেখা যায়।

অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তবৃত্তিগুলি নিরুদ্ধ হ'লে প্রথমে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়। বিষয়ভেদে এই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি চারপ্রকার—(ক) সবিতর্ক (খ) সবিচার (গ) সানন্দ (ঘ) সাস্মিত। এদের বিষয় যথাক্রমে বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা।

সাধারণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে সকল বিষয় গৃহীত হয় তারা স্থূল বিষয়—যেমন গো, অশ্ব, ঘট, পটাদি। এইসব স্থূল বিষয় যখন শব্দবাচ্যরূপে সমাধিপ্রজ্ঞার বিষয় হয় তখন সেই সমাধিকে বলা হয় সবিতর্ক সমাধি। অর্থাৎ সবিতর্ক

সমাধি অবস্থায় যোগীর কোনও একটি শব্দবাচ্য স্থূল বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ ও ওতপ্রোত সম্যক্ প্রজ্ঞা হয়।

স্থূলবিষয়ক সমাধি আয়ত্ত হলে যোগীর বিচারবিশেষের দ্বারা তন্মাত্রাদি সূক্ষ্মবিষয়ের সম্প্রজ্ঞান হয়। একেই বলে সবিচার সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। সবিচার সমাধিতেও বাচকশব্দের অপেক্ষা থাকে কারণ শব্দ ব্যতীত বিচার হয় না।

সানন্দ অবস্থা অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তরের। এই অবস্থায় বাচকশব্দের তত অপেক্ষা নাই। আমাদের শরীর জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয়, চিত্ত ও প্রাণের অধিষ্ঠাতা। অভ্যাসের ফলে এই সকল করণাদির সহিত অধিষ্ঠাতা শরীরের যখন বিশেষ একপ্রকার স্থৈর্য সিদ্ধ হয় তখন এক সর্বব্যাপী সাত্ত্বিক সুখ অনুভূত হয়। সর্বশরীরের ঐ আনন্দময় সাত্ত্বিক ভাবের সহজ বোধই সানন্দ সমাধির আলম্বন।

সাস্মিত সমাধির আলম্বন হচ্ছে মহান্ আত্মা বা ব্যবহারিক গ্রহীতা। এই ব্যবহারিক গ্রহীতা কিন্তু স্বরূপতঃ পুরুষ নন্। সাংখ্যে এঁকে মহত্তত্ত্ব বলা হয়েছে। ‘অস্মিতা’ মাত্র বা ‘আমি’ এই বোধ মাত্রই সাস্মিত সমাধির বিষয়। এটি বুদ্ধির অভিমান। সত্ত্বগুণপ্রধান বলে একে পুরুষ বলে ভ্রম হয়। যাই হোক্ সম্প্রজ্ঞাত সমাধির এই সাস্মিত অবস্থাই সর্বোচ্চ। তবুও স্মরণে রাখতে যে সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে নিরোধ অসম্পূর্ণ থাকে। কেননা অত্যন্ত সূক্ষ্ম আকারে এবং স্থিরভাবে হলেও বিষয়াকার আলম্বন যেহেতু থেকেই যায় সেহেতু সম্প্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থায় চিত্তবৃত্তি কখনওই সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হ'তে পারে না।

অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি সম্পূর্ণ নিরালম্ব—পরবৈরাগ্যের বা নিরুপপ্লবা বিবেক-খ্যাতির অভ্যাসসাধ্য সংস্কার। আমরা দেখেছি যে সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে স্থূলতত্ত্ব হতে ক্রমান্বয়ে অস্মিভাবে চিত্ত সমাহিত হয়। অস্মিতাতে অবশ্যই স্থূল ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান থাকে না—তবে সে অবস্থায়ও সূক্ষ্ম বিজ্ঞানের জ্ঞান থাকে। যখন সেই অস্মিতাবও চাই না মনে করে যোগী নিরোধ আনয়ন করতে পারেন তখনই তাঁর চিত্তবৃত্তি রুদ্ধ হ'য়ে চিত্ত লীন বা অভাবগ্রস্তের মত হয়ে যায়। এই অবস্থাই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। এই অবস্থায় মনের সঙ্গে শারীর-যন্ত্রের ক্রিয়াও রুদ্ধ হয়ে যায় এবং স্তম্ভিতপ্রাণ (in suspended animation) অবস্থায় থাকে। নিরোধভঙ্গে আবার শরীরের যান্ত্রিক ক্রিয়া ফিরে এসে পূর্ববৎ অবস্থা হয়।

নির্বীজ সমাধি দুই প্রকার—উপায়প্রত্যয় ও ভবপ্রত্যয়। যোগীদের উপায়প্রত্যয়। বিদেহলীন ও প্রকৃতিলীনদের ভবপ্রত্যয় হয়। 'ভব' শব্দের অর্থ জন্মের হেতুভূত অবিদ্যারূপ সংস্কার। যে সকল যোগী বিষয় ত্যাগকেই পরাকাষ্ঠা মনে করে তাতেই আনন্দলাভ করেন তাঁদের ক্ষেত্রে বিষয়ের অভাবে ইন্দ্রিয়াদি করণগুলি লীন হয়ে যায় এবং দেহান্তে তাঁরা নির্বীজ সমাধি লাভ করেন। এঁদেরই বলা হয় বিদেহলীন। কিন্তু পরমপুরুষতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার না হওয়াতে এঁরা শাশ্বতী শান্তিলাভ করতে পারেন না। যে সকল যোগী পরমপুরুষতত্ত্ব সাক্ষাৎ করেননি কিন্তু বিষয়বিয়োগহেতু যাঁদের অন্তঃকরণ মূলা প্রকৃতি লীন হয়েছে তাঁদের প্রকৃতিলীন বলা হয়। সম্পূর্ণ বিবেকখ্যাতি হয়ে পুরুষসাক্ষাৎকার হলে তবেই সত্যকার সম্পূর্ণ সমাধিলাভ হয় এবং চিত্তের বীজ সম্যক্‌ভাবে দগ্ধ হয়।

এই অবস্থায় আসবার জন্য সাধন হিসাবে সূত্রকার শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি ও সমাধির উল্লেখ করেছেন।

শ্রদ্ধা অর্থে প্রসন্নচিত্তে বর্ধমান প্রীতি ও আসক্তির সঙ্গে বিষয়ের গুণাবিষ্কার পূর্বক জানবার ইচ্ছা।

চিত্ত বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট হ'লে বা ক্লান্ত হ'লে যে বলের দ্বারা তাকে পুনর্বার-সাধনে নিযুক্ত করা যায় তাকেই বলা হয় বীর্য।

স্মৃতি হচ্ছে অনুভূত যে ধ্যেয়ভাব বার বার তাকে যথাবৎ অনুভব করা এবং অনুভব যে করছি এবং করবো তাও অনুভব করা।

শ্রদ্ধা হতে হয় বীর্য, বীর্য হতে হয় স্মৃতি। স্মৃতি স্থিরা ও ধ্রুবা হলে সমাধি হয়। সমাধিতেই প্রজ্ঞা, অর্থাৎ সর্বতো পুঙ্খানুপুঙ্খ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও যথাযথ খ্যাতি বা প্রকাশ হয়। প্রজ্ঞার দ্বারাই দ্রষ্টা পুরুষ প্রকৃতি হ'তে বিবিক্ত হয়ে স্বরূপে অবস্থান করেন এবং তাঁর কৈবল্যপ্রাপ্তি হয়।

এই দ্রষ্টা পুরুষ মহান্ আত্মা হতে ভিন্ন। কর্তা, জ্ঞাতা ও ধর্তা বললে সাধারণত আমরা যা বুঝি তাই সেই মহান্ আত্মা। বুদ্ধিরূপে সেই মহান্ আত্মা প্রকৃতির বিকার—দৃশ্যমাত্র। চিতিশক্তি বা দ্রষ্টা বা শুদ্ধচৈতন্য ঐ মহান্ আত্মা নয়।

সূত্রকার এই প্রসঙ্গে ঈশ্বরতত্ত্বের আলোচনা করেছেন। অভ্যাস, বৈরাগ্য, শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি ইত্যাদি ছাড়াও ঈশ্বরপ্রণিধানও সমাধির অন্যতম সাধন বলে

তিনি স্বীকার করেছেন। তখন স্বতঃই প্রশ্ন ওঠে পাতঞ্জল মতে ঈশ্বরের স্বরূপ কী এবং ঈশ্বরপ্রণিধান বলতেই বা তাঁরা কী বোঝেন?

ঈশ্বর

পাতঞ্জলসূত্রোক্ত ঈশ্বর ক্লেশ, কর্ম, বিপাক এবং আশয় দ্বারা অপরামৃষ্ট পুরুষ বিশেষ। এইটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে ঈশ্বরকে যোগশাস্ত্রে পুরুষ বা প্রকৃতির স্রষ্টারূপে কল্পনা করা হয়নি। ঈশ্বর পুরুষদের মধ্যে অন্যতম তবে তিনি বিশেষ। কিসে বিশেষ? উত্তর হ'ল যে তিনি অন্যান্য পুরুষদের ন্যায় ক্লেশ, কর্ম, বিপাক বা আশয়ের দ্বারা পরামৃষ্ট নন্।

ক্লেশ—পাতঞ্জলশাস্ত্রে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ নামে পঞ্চক্লেশের উল্লেখ আছে। সকল ক্লেশেরই সাধারণ লক্ষণ হ'ল যে তারা হয় কষ্টদায়ক ভ্রান্ত জ্ঞান অথবা ভ্রান্ত জ্ঞানের কার্য। বস্তুত অস্মিতাদি চারটি ক্লেশ অবিদ্যামূলক। সকল ক্লেশেরই চার প্রকার অবস্থাভেদ হ'তে পারে—যথা প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন, উদার। প্রসুপ্ত ক্লেশ বীজ বা শক্তিরূপে থাকে, আলম্বন পেলেই পুনরুজ্জীবিত হয়। তনু ক্লেশ হচ্ছে ক্রিয়াযোগের দ্বারা ক্ষীণীভূত ক্লেশ। অন্য ক্লেশের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হলে ক্লেশটি হয় বিচ্ছিন্ন ক্লেশ। আর উদার হচ্ছে ব্যাপারযুক্ত ক্লেশ। উদাহরণ যথা ক্রোধকালে দ্বেষ উদার, রাগ বিচ্ছিন্ন। বৈরাগ্য অভ্যাস করলে রাগ তনু হয়ে যায়। আর সম্পূর্ণ বিবেকখ্যাতি না হওয়া পর্যন্ত সংস্কাররূপ সকল ক্লেশই প্রসুপ্ত থাকে।

অবিদ্যা—(ক) অনিত্য (খ) অশুচি (গ) দুঃখ এবং (ঘ) অনাত্মাকে নিত্য, শুচি, সুখ এবং আত্মা ভ্রম করাই অবিদ্যা।

(ক) দৃষ্টান্ত—স্বর্গবাসীরা অমর, চন্দ্রতারকাযুক্ত আকাশ নিত্য ইত্যাদি জ্ঞান।

(খ) দৃষ্টান্ত—সুন্দরী নারীর অবয়বকে অমৃতনির্মিত বলে জ্ঞান।

(গ) দৃষ্টান্ত—অন্নপানাদিতে সুখ জ্ঞান।

(ঘ) দৃষ্টান্ত—পুত্র, কলত্র বা সম্পত্তিতে আমি বা আমার জ্ঞান। যার ফলে এ সকলের ক্ষতিতে যেন আমারই সর্বনাশ হ'ল এরূপ ভ্রান্তি। সাধারণ ভ্রান্তিকে যোগীরা অবিদ্যা বলেন না। পারমার্থিক ও যোগসাধনসম্বন্ধীয় নাস্ত ভ্রান্তিকেই তাঁরা অবিদ্যা বলে থাকেন।

অস্মিতা—পুরুষ দৃক্‌শক্তি ও বুদ্ধি দর্শন শক্তি। এই দুইকে ভ্রমক্রমে এক

জ্ঞান করাকেই অস্মিতা ক্লেশ বলা হয়। এর ফলেই প্রকৃতির গুণবশত যা কিছু ঘটে অহঙ্কারবিমূঢ় হয়ে আমরা ভাবি যে আমরাই তার কর্তা।

রাগ—যে জীবের একবার সুখের অভিজ্ঞতা হয়েছে তার সুখের সাধনের জন্য যে স্পৃহা, তৃষ্ণা ও লোভ হয় তাকেই বলে রাগ। ইন্দ্রিয়গুলি অনাত্মা। অথচ নির্লিপ্ত আত্মাকে সেই ইন্দ্রিয়ের প্রতি আরোপ করে ইন্দ্রিয়সুখকেই আত্মার সুখ মনে করে লুব্ধ এবং তৃষ্ণার্ত হওয়া একরকম অবিদ্যাজনিত ক্লেশ।

দ্বেষ—দুঃখাভিজ্ঞ জীব দুঃখের স্মৃতি থেকে দুঃখের সাধনগুলির প্রতি যে প্রতিঘাত ও হননেচ্ছা এবং ক্রোধ অনুভব করে তারই নাম দ্বেষ। এখানেও অনাত্ম ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে আত্মার ভ্রান্ত একীকরণ এবং অকর্তা আত্মাকে বিপর্যস্ত ভাবে কর্তাজ্ঞান করায় একপ্রকার ক্লেশ উৎপন্ন হয়।

অভিনিবেশ—এই সহজাত ক্লেশ অবিদ্বানের ন্যায় বিদ্বানকেও ক্লিষ্ট করে। সমস্ত প্রাণীই নিত্য প্রার্থনা করে—'আমি যেন জীবিত থাকি'। সেই হেতু জাতমাত্রেরই মরণত্রাস দেখা যায়। অথচ মৃত্যুর পূর্বে তো মরণের অভিজ্ঞতা হবার সম্ভাবনা নেই। সুতরাং যোগশাস্ত্রে বলা হয় যে জীবমাত্রেরই সহজাত মরণত্রাস থেকে পূর্ব জন্মানুভূত মরণদুঃখের অনুমান করতে হয়। এই মৃত্যুভয় কিন্তু অবিদ্যামূলক। কেননা অবিদ্যাবশত দেহেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধিতে অহংভাবের উদয় হওয়ায় ফলেই আমাদের মৃত্যুভয় উপস্থিত হয়। কিন্তু বিবেকীর দৃষ্টিতে পুরুষের জন্ম বা মৃত্যু হতেই পারে না। যার জন্ম বা মৃত্যু হয় সে প্রকৃতিরই বিকারমাত্র।

ঈশ্বর যেহেতু মূলক্লেশ অবিদ্যারহিত (কেননা তিনি চিতিশক্তির পরাকাষ্ঠা) সেহেতু অন্য ক্লেশগুলিও তাঁকে স্পর্শ করে না।

কর্ম—কর্ম দু' প্রকার—ধর্ম ও অধর্ম। বেদবিহিত কর্ম ধর্ম, বেদনিষিদ্ধ অধর্ম। ঈশ্বরের পক্ষে বিধি বা নিষেধ অর্থহীন। ঈশ্বর আপ্তকাম সুতরাং তাঁর কর্মে প্রবৃত্তি থাকতেই পারে না।

বিপাক—বিপাক বা কর্মফল তিনটি—জাতি, আয়ু ও ভোগ। সৎ শুচি পিতামাতার গৃহে জন্মগ্রহণ করব না কৃমিকীটের সন্তান হয়ে জন্মাব তা নির্ভর করে আমার কর্মের উপর। কর্মের ফলে পরিমিত ধর্ম এবং অধর্ম বা পুণ্য এবং পাপ সঞ্চিত হয়। এরই ফলে সুখ এবং দুঃখভোগ ঘটে। এই ভোগের দ্বারাই সঞ্চিত কর্মফলের ক্ষয় হয় যেমন ভোগের দ্বারাই সঞ্চিত ধনরাশিরও ক্ষয়

হয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ ভোগের জন্য নির্দিষ্ট আয়ুষ্কালের প্রয়োজন। সেই জন্যই বলা হয়েছে যে কর্মের ফল হিসাবেই ব্যক্তির আয়ু নির্দিষ্ট হয় এবং সুখ-দুঃখরও ব্যবস্থা হয়। প্রাচীন ভারতীয় চিন্তায় বিপাক বা কর্মফল বলতে মাত্র এই তিনটিকেই বোঝাত। অনেকে কর্মফলবাদের নিন্দা করে বলেছেন যে সবকিছুই যখন অদৃষ্ট কর্মেরই ফল তখন আর এ জন্মে সদিচ্ছা, সুচেষ্টা ইত্যাদিও আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে না। কিন্তু শাস্ত্রে ইচ্ছা, চেষ্টা, প্রবৃত্তি এগুলি বিপাক বলে স্বীকৃতই হয়নি। জাতি, আয়ু ও ভোগ এই তিনটিই মাত্র বিপাক। ঈশ্বরের কর্ম নেই বলে বিপাকও থাকতে পারে না।

আশয়—এই শব্দটির অর্থ সংস্কার। এই সংস্কার পাপকর্ম বা পুণ্য-কর্মজনিত হয়। ঈশ্বরের কর্ম নাই সুতরাং আশয়ও নাই। মুক্তপুরুষদেরও অবশ্য ক্লেশকর্মবিপাকাশয় নাই। কিন্তু তাঁদের ক্লেশাদি এককালে ছিল এখন নাই। ঈশ্বরের ক্ষেত্রে কিন্তু এগুলির অভাব কালের দ্বারা নিরবচ্ছিন্নরূপেই দেখা যায়।

এই বিশেষপুরুষ ঈশ্বরের সপক্ষে পতঞ্জলি নিম্নে উল্লিখিত যুক্তিগুলি দেন।

যেখানেই অল্প, বহু, বহুতর, বহুতম করে ক্রমবর্ধমান কোনও গুণকে সাজাই সেখানেই যুক্তিসঙ্গতভাবে একটি নিরতিশয় বা পরাকাষ্ঠা স্বীকার করতে হয়। সর্বজ্ঞতার বিচারে প্রাণীদের এরকম ক্রমিক তারতম্য দেখা যায়। অতএব সর্বজ্ঞতার একটি নিরতিশয় বা পরাকাষ্ঠা স্বীকার করতে হবে। যে পুরুষে এই সর্বজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা হয়েছে তিনিই ঈশ্বর।

অনুমানপ্রমাণের সাহায্যে 'সর্বজ্ঞপুরুষ আছেন' এই রকম সামান্যের নিশ্চয়মাত্র হয়। কিন্তু ঈশ্বরের সংজ্ঞাদি বিশেষ জ্ঞান আগম হতে জানতে হবে।

যোগশাস্ত্রে এই সর্বোত্তম নিত্যমুক্তপুরুষকে কিন্তু জগতের উপাদান বা নিমিত্ত কারণ হিসাবে স্বীকার করা হয়নি। এ বিষয়ে সাংখ্য ও যোগ সিদ্ধান্ত অভিন্ন। কিন্তু যোগশাস্ত্রে বলা হয় যে প্রলয়ান্তে প্রতি সর্গের প্রারম্ভে করুণাপরবশ হয়ে ঈশ্বর জ্ঞানধর্ম উপদেশ করেন। সাংখ্যাচার্যগণ অবশ্য কপিলমুনিকেই আদিবিদ্বান দেশিকোত্তম বলেছেন। কিন্তু পতঞ্জলি বলেন যে ঈশ্বর পূর্ব পূর্ব সকল গুরুর গুরু কেননা তিনি কালের অতীত। প্রণব বা ওঁকারই ঈশ্বরের বাচক।

ঈশ্বর প্রণিধান করতে হলে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা এই চার

ভাবনার অভ্যাস করতে হবে। যাদের সুখে আমার স্বার্থসাধিত হয় না বা স্বার্থের ব্যাঘাত হয় তাদের সুখ হচ্ছে দেখলে বা ভাবলে সাধারণ মানুষের চিত্তে ঈর্ষা হয়। সেইরকম শত্রুর দুঃখ দেখলে নিষ্ঠুর হর্ষ হয়। যে আমার স্বমতাবলম্বী নয় অথচ পুণ্যবান্ তার প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি দেখলে হিংসা হয়, মনে সুখ থাকে না। আর অপুণ্যকারীদের প্রতি ক্রোধ বা হিংসাই স্বাভাবিক। এই সব নীচ ভাব আমাদের চিত্তকে আলোড়িত ক'রে সমাধির পথে বাধা জন্মায়। সুতরাং সর্বজীবে মৈত্রীভাবনা করতে হবে অর্থাৎ শত্রুর সুখেও মিত্রের সুখের মত সুখী হ'তে হবে। শত্রুর দুঃখকে প্রিয়জনের দুঃখ মনে করে করুণাভাবের সাধন করতে হবে। সধর্মী বিধর্মী সকলের পুণ্যাচরণেই মনে মুদিতাভাব আনতে হবে। এবং পরের দোষ দেখেও অগ্রাহ্য করতে হবে। ক্রোধ বা পৈশুন্য বর্জন করে উপেক্ষাভাবের সাধনাই কর্তব্য। বৌদ্ধরাও এই চার সাধনকে অতি উচ্চস্থান দেন এবং তাঁরা এই সাধনমার্গে থাকাকে 'ব্রহ্মবিহার' আখ্যা দেন।

সাধনপাদ

যোগ মুখ্যত সাধনশাস্ত্র বা প্রয়োগবিদ্যা। যোগসূত্রের সাধনপাদে এ বিষয়ে বিস্তারিত উপদেশ দেওয়া হয়েছে। বিবেকখ্যাতি (অর্থাৎ 'প্রকৃতি পুরুষে তাদাত্ম্য নেই' এরূপ নিশ্চয়)—যাকে সূত্রকার দৃক্‌দৃশ্যের সংযোগের উচ্ছিত্তি এবং হানোপায় বলে উল্লেখ করেছেন তা লাভ করতে হ'লে যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান করতে হবে। এই যোগাঙ্গ সংখ্যায় আটটি। প্রশ্ন হতে পারে যে অনুমান, শ্রুতি ইত্যাদি প্রমাণজনিত বিবেকজ্ঞানও তো হতে পারে। এরকম জ্ঞান যে হয় শাস্ত্রে তা স্বীকৃত হয়েছে। তবে যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান দ্বারা যত অশুদ্ধি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এই বিবেকজ্ঞান ততই দীপ্তিমান্ হয়ে ওঠে, যেমন যোগীদের ক্ষেত্রে। অশুদ্ধি অর্থে অজ্ঞান ও তজ্জনিত সংস্কার। যোগীর সমাধিযোগে যে জ্ঞান হয় তা অনুমিত বা শ্রুত যে কোনও জ্ঞানের অপেক্ষায়ই পরমপ্রত্যক্ষ। পরমপ্রত্যক্ষের নিশ্চয়ের কোনও তুলনা নেই। যোগানুষ্ঠান অবিদ্যানাশ ও বিদ্যাপ্রাপ্তি ও মোক্ষের কারণ।

যোগানুষ্ঠানের অঙ্গগুলির নাম যথাক্রমে—(ক) যম (খ) নিয়ম (গ) আসন (ঘ) প্রাণায়াম (ঙ) প্রত্যাহার (চ) ধারণা (ছ) ধ্যান ও (জ) সমাধি।

(ক) যম পাঁচটি—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ। অহিংসা

অর্থে সর্বপ্রকারে সর্বদা সর্বভূতের প্রতি অনভিদ্রোহ। অহিংসার একটি ইতিবাচক ভাবও আছে—সেটি হচ্ছে মৈত্রী। একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে কায়িক হিংসা ছাড়াও মানসিক ও বাচনিক হিংসাও পরিহর্তব্য। তবে যোগীরা যেমন অহিংসা মহাব্রত পালন করেন সাধারণ লোকে তেমন পারেন না। আততায়ি-বধ, ভক্ষ্য শস্যবৃক্ষাদি নাশ, অপকারী প্রাণীর নাশ ইত্যাদিকে সাধারণ লোকে হিংসা বলে গণ্যই করেন না। দেহধারণ করতে হলে কিছু ভক্ষণ করতেই হবে। প্রতি পদক্ষেপে কিছু জীবাণুর প্রাণহানি হবেই। এমন কি যোগী যদি অকালে অনাহূত গৃহস্থের বাড়িতে অন্নগ্রহণ করেন তবে তাঁদেরও কিঞ্চিৎ পীড়ন করা হবে। অবশ্যম্ভাবী কিছু হিংসা অত্যাজ্য হলেও যোগী যথাশক্তি হিংসাবর্জনের সঙ্কল্প করে চিত্তশুদ্ধি করবেন এই বিধি।

সত্যের পথ ক্ষুরধার। অতি অল্পলোকেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে আগ্রহী হন। পরন্তু তত্ত্ব বা সত্য অপ্রিয় হ'লে মৌন থাকাই বিধেয়। সদুদ্দেশ্যেও অসত্যকথন বর্জন করতে হবে। অর্ধসত্য যথা 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ' অসত্যেরই মত বর্জনীয়।

যা নিজস্ব নয় তা অগ্রহণ এমন কি তাতে কোনও স্পৃহাও না রাখা হ'ল অস্তেয়। ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে—'মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।'

জননেন্দ্রিয়ের সংযমই ব্রহ্মচর্য। এই উদ্দেশ্যে অন্যান্য সকল ইন্দ্রিয়কেও সংযত করে মিতাহার ও মিতনিদ্রা অভ্যাস করতে হবে এবং কামবিষয়ক সকল কল্পনাবিলাসও পরিত্যাগ করতে হবে।

বিষয়ের অর্জনে, রক্ষণে, ক্ষয়ে, গ্রহণে অতি অবশ্যই দুঃখ এইটি হৃদয়ঙ্গম করে কেবল প্রাণধারণের উপযুক্ত দ্রব্যমাত্র গ্রহণ করাই হ'ল অপরিগ্রহ। অধিক ভোগ্যবস্তুর অধিকারী হয়ে থাকলে যোগসিদ্ধি দূরস্থ হয়।

(খ) নিয়মও পাঁচটি—শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরপ্রণিধান।

শৌচ দুই প্রকার—বাহ্য ও আভ্যন্তর। মাটি জল ইত্যাদি দ্বারা ক্ষালন করে দেহের যে শুচিতা আনা হয় তা বাহ্য শৌচ। নিজ শরীর ও আবাস নির্মল রাখা এবং পবিত্র আহার করা যোগীর বিধেয়। মদ্য মাংসাদি গ্রহণে চিত্তের স্থৈর্য নষ্ট হয় ও ব্রহ্মচর্যের হানি হয়। অহঙ্কার, অভিমান, অসূয়া ইত্যাদি চিত্তমলগুলির ক্ষালন আভ্যন্তর শৌচ। মদমত্ত, অভিমানী বা অসূয়াযুক্ত চিত্ত সর্বদা বিক্ষুব্ধ ও তাড়িত থাকায় সমাধিস্থ হতে পারে না।

ইষ্টপদার্থ লাভ করলে যে তুষ্টি লাভ হয় তারই ভাবনা করে শেষে যা পেয়েছি তাতেই সেই তুষ্টির ধ্যান করতে হয়। এরই নাম সন্তোষ। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে পায়ে পাছে কাঁটা ফোটে সেই ভয়ে সমস্ত ক্ষিতিতল ঢেকে ফেলার তো কোনও প্রয়োজন নেই। নিজের পা দুটিকে পাদুকাবৃত করলেই যথেষ্ট। তেমনই সমস্ত কাম্যবিষয় পেয়ে তবে তুষ্ট হব এরকম আকাঙ্ক্ষায় সুখ হয় না। সুখ খালি সন্তোষের দ্বারাই পাওয়া যায়।

যোগ বা চিত্তস্থৈর্যকে উদ্দেশ করে যেসব ক্রিয়া বা কর্ম অনুষ্ঠিত হয় তাদের বলা হয় ক্রিয়াযোগ। ক্রিয়াযোগ সাধারণত তিন ভাগে বিভক্ত—তপঃ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরপ্রণিধান। বিষয়সুখ ত্যাগ অর্থাৎ কষ্টসহন করে—যথা উপবাস কবে বা শয্যাগ্রহণ না করে—যে যে কর্মে আপাততঃ সুখ হয় সেই সেই কর্মের নিরোধের চেষ্টাকে তপশ্চর্যা বলা হয়। শরীরের ধাতুবৈষম্য না ঘটিয়ে চিত্তকে রাগদ্বেষবিনির্মুক্ত ক'রে যে কষ্ট সাধন তাই হ'ল সঠিক তপশ্চর্যা তপঃ শারীর ক্রিয়াযোগ।

স্বাধ্যায় বাচিক ক্রিয়াযোগ। মোক্ষশাস্ত্রাধ্যয়ন করাই মূলত স্বাধ্যায়। এর ফলে বিষয়চিন্তা ক্ষীণ হয় এবং পরমার্থে রুচি ও জ্ঞান বাড়ে।

ঈশ্বরপ্রণিধান মানস ক্রিয়াযোগ। নিজের চিত্তকে প্রশান্ত ঈশ্বরচিত্তে স্থাপন করে অর্থাৎ আত্মা বা পুরুষকে ঈশ্বরে এবং ঈশ্বরকে নিজেতে ভেবে, জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য চেষ্টাগুলি যেন 'ঈশ্বরের দ্বারাই হচ্ছে, আমি অকর্তা' প্রত্যেক কর্মে এইরকম ভাবনা করে সর্বকর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করাকেই ঈশ্বরপ্রণিধান বলা হয়। এই ঈশ্বরপ্রণিধান করতে করতে যোগীর চিত্তমালিন্য দূর হয়ে স্বরূপদর্শনও হয়। অর্থাৎ যোগীর এই বোধের উদয় হয় যে ঈশ্বর যেমন শুদ্ধ (ধর্মাধর্মবিরহিত) প্রসন্ন (অবিদ্যাদিক্লেশশূন্য) কেবল এবং বিপাকবর্জিত (জাত্যায়ুর্ভোগরূপ কর্মফলরহিত) পুরুষ—তেমনই এই বুদ্ধির প্রতিসংবেদী প্রত্যগাত্মাও নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত। এইভাবেই বুদ্ধি হতে পুরুষ বিবিক্ত হয়ে সমাধিলাভ করেন।

(গ) তৃতীয় যোগাঙ্গ আসন সম্পর্কে সূত্রকার বলেন 'স্থিরসুখমাসনম্'। অর্থাৎ নিশ্চল ও সুখাবহ উপবেশনই আসন। এই আসন নানা প্রকারের হয়। হঠযোগীরা বর্তমানে যোগাসনের বহুল প্রচার করাতে আসনের লৌকিক উপকারিতা বিষয়ে সাধারণে অবগত হয়েছেন। যোগীদের পক্ষে সুস্থ ও শুচি দেহ সমাধিলাভের পক্ষে বিশেষভাবে অনুকূল। স্থির হয়ে

আসন করতে করতে শরীর শূন্যবৎ হয় এবং যোগী সহজে ক্ষুৎপিপাসা শীততাপে কাতর হন্ না। ক্রমশ শারীরবোধ বিলীন হয়ে যোগীর মনে হয় যে তিনি অনন্ত আকাশে মিলিয়ে গেছেন এবং তিনি আকাশের মতই সর্বব্যাপী। একেই অনন্ত সমাপত্তি বলা হয়।

(ঘ) প্রাণায়াম—বায়ুর শ্বাসরূপ যে আভ্যন্তরিক গতি এবং প্রশ্বাসরূপ যে বহির্গতি তার বিচ্ছেদই প্রাণায়াম। আসন সিদ্ধ হ'লে তবে প্রাণায়াম হয়। অস্থির চিত্তে প্রাণায়াম করলে তা যোগাঙ্গ হয় না। স্বাভাবিকভাবে আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাস একটি ছন্দ অনুসারে যতিহীনভাবে চলে। প্রাণায়ামের উদ্দেশ্য এই শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে মধ্যে গতিবিচ্ছেদ আনা। শ্বাস নিয়ে প্রশ্বাস না ফেলে থাকলে যে গতিবিচ্ছেদ হয় সেটি একটি প্রাণায়াম। প্রশ্বাস ফেলে শ্বাস না নিয়ে থাকলে যে গতিবিচ্ছেদ ঘটে সেটিও একটি প্রাণায়াম। পরম্পরাক্রমে এই-রকম এক একটি প্রাণায়াম অভ্যাস করতে হয়। এই গতিবিচ্ছেদের সময় চিত্তকে অচল এবং একাগ্র করে রাখতে হয়। এই গতিরোধ তিন প্রকার—বাহ্যবৃত্তি, আভ্যন্তরবৃত্তি ও স্তম্ভবৃত্তি। অবশ্য কোনও কোনও লোক স্বাভাবিক-ভাবেই প্রাণরোধ করে দীর্ঘকাল জড়বৎ থাকতে পাবে এবং হঠযোগী এই ক্ষমতা দেখিয়ে স্থানবিশেষে অর্থোপার্জনও করেন। কিন্তু সেই সঙ্গে যদি চিত্তের স্থৈর্য ও নির্বিষয়তার বৃদ্ধি না হয় তবে এ সবই নীচস্তরের বাজীকরের ক্রীড়ামাত্রে পর্যবসিত হয় এবং প্রতীচ্যে এইজন্যই যোগ সম্বন্ধে এত সংশয় এবং তাচ্ছিল্যের ভাব দেখা যায়। প্রাণায়াম মূলত শরীরেন্দ্রিয়ের নৈষ্কর্ম্য। 'আমি শরীর' 'আমি ইন্দ্রিয়বান্' ইত্যাদি যেগুলিকে যোগশাস্ত্রে অবিদ্যারূপ অজ্ঞান বলে চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলি প্রাণায়ামক্রিয়ার দ্বারা ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে যায়। সংশয়ী বলতে পারেন যে অজ্ঞান তো জ্ঞাননাশ্য। প্রাণায়াম ক্রিয়ার দ্বারা ভাব নাশ হবে কেমন করে? তার উত্তর এই যে প্রাণায়াম ক্রিয়া বটে; কিন্তু সেই ক্রিয়ার দ্বারা যে জ্ঞান হয় তাই অজ্ঞানকে নাশ করে। প্রাণায়াম শরীরেন্দ্রিয় হ'তে আমিত্বকে বিযুক্ত করার ক্রিয়া। সেই ক্রিয়ার জ্ঞানের (সকল ক্রিয়ারই জ্ঞান হয়) আকার হ'ল—'আমি শরীরেন্দ্রিয় নই'। এই জ্ঞানই অবিদ্যা নাশ করে। এইভাবে অজ্ঞানের নাশ হলে প্রকাশাবরণ ক্ষীণ হয়ে তত্ত্বজ্ঞান হয়।

(ঙ) প্রত্যাহার অর্থে চিত্তের মত ইন্দ্রিয়গণেরও বিষয়ের থেকে বিযুক্ত হয়ে নিরুদ্ধ হওয়া। যোগী ইচ্ছাপূর্বক চিত্তকে যেদিকে রাখেন ইন্দ্রিয়রাও

তখন সেদিকেই থাকে। প্রত্যাহার বা ইন্দ্রিয়বর্গের বিষয়বিযুক্তি সাধনের উপায় দুটি—(ক) বাহ্য বিষয় লক্ষ্য না করা (খ) মানস ভাব নিয়ে থাকা। উন্মাদ রোগে (psychosis) বা আবেশে (hypnosis) এক ধরণের অবশ প্রত্যাহার ঘটে। কিন্তু যোগীর প্রত্যাহারের বিশেষ এই যে যোগী স্বেচ্ছায় ইন্দ্রিয়বর্গকে বিষয় হতে বিযুক্ত করেন। যোগী যখন ইচ্ছা করেন 'আমি এটি জানব না' তখনই তাঁর ঐ জ্ঞানেন্দ্রিয় শক্তি রুদ্ধ হয়ে যায়। যমনিয়মাদি অভ্যাস করে পরে প্রত্যাহার করলে তবেই সুফল পাওয়া যায় নচেৎ নয়।

(চ) ধারণা হচ্ছে ধ্যেয়দেশে চিত্তকে আবদ্ধ করা। অর্থাৎ যে দেশে ধ্যেয়বস্তুকে ধ্যান করতে হবে সেই দেশে চিত্তকে আবদ্ধ করা ধারণা।

(ছ) প্রত্যয়ের একতানতাই বা ধ্যেয় বস্তুতে চিত্তকে আবদ্ধ করাই ধ্যান। যে কোনও বিষয়ে যোগী ধ্যান করতে পারেন। ধারণার প্রত্যয় যেন বিন্দু বিন্দু জলধারার মত; আর ধ্যানের প্রত্যয় যেন তৈলধারার মত একতান।

(জ) ধ্যানের চরম উৎকর্ষের নাম সমাধি। সমাধি চিত্তস্থৈর্যের সর্বোত্তম অবস্থা। এই অবস্থায় ধ্যেয় বিষয় হ'তে নিজের পার্থক্য আর জ্ঞানগোচর হয় না। সাদা কথায় যোগী আত্মহারা হয়ে যান্। প্রসঙ্গান্তরে সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ধারণা, ধ্যান ও সমাধি তিনটিকে একত্রে 'সংযম' নাম দেওয়া হয়। সংযম জয় করলে প্রজ্ঞালোক অর্থাৎ জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় সম্বন্ধে তাত্ত্বিক প্রজ্ঞা হয়। পূর্বে কথিত যমাদি পাঁচটি বহিরঙ্গ এবং ধ্যানাদি তিনটি অন্তরঙ্গ সাধন।

বিভূতিপাদ

সূত্রের বিভূতিপাদে যোগাঙ্গানুষ্ঠানের বহুবিধ অলৌকিক ফলশ্রুতি পাওয়া যায়। তবে সেগুলি যোগীকে সাধনে প্রবৃত্ত করবার উদ্দেশ্যে অর্থবাদ কি না সে কথা বিবেচ্য। এও স্মর্তব্য যে যোগীর মূল বা একমাত্র লক্ষ্য যে বিবেক-খ্যাতি এবং তজ্জনিত পরাবৈরাগ্য ও অন্তে কৈবল্য একথা সূত্রকার বারবার বলেছেন এবং অন্যান্য সকল সিদ্ধিই এই পরাসিদ্ধির সোপান মাত্র সে কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এমন কি কৈবল্যপাদে সূত্রকার স্বীকার করেছেন যে নানাপ্রকারের সিদ্ধি যথা অলৌকিক দৃষ্টি-পরচিত্তজ্ঞতা ইত্যাদি জন্ম, ওষধি

মন্ত্র ইত্যাদি বলেও হতে পারে। তবে এ সকল সিদ্ধি যোগীর মূল লক্ষ্য নয়। যোগীর মূল লক্ষ্য হ'ল কৈবল্য অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের সংযোগের উচ্ছিত্তি।

কৈবল্যপাদ

এখন প্রশ্ন ওঠে যে সমাধিযোগে বিবেকখ্যাতি হয়ে কৈবল্যলাভের পর যোগীর শরীরের কি বিনাশ ঘটে? তা যে ঘটে না এ তো আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা। কর্মফলানুযায়ী নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত শরীর থাকে। কিন্তু চিত্ত তো নিরুদ্ধ হয়ে গেছে। তবে কি শরীর জড়পিণ্ডের মত কাজ করে চলে? এই প্রসঙ্গে যোগশাস্ত্রে 'নির্মাণ চিত্তের' কথা বলা হয়েছে।

নির্মাণ চিত্ত—বিবেকখ্যাতি বা প্রসংখ্যানের দ্বারা যোগীর দগ্ধ বীজকল্প চিত্তের আর কোনও আপনার স্বার্থসিদ্ধির অনুকূল কার্য থাকে না। এরূপ উচ্চ কোটির যোগীও অন্য ভূতবর্গের কল্যাণকল্পে যোগবলে অনেক শরীর ও অনেক চিত্ত নির্মাণ করে অনুগ্রহ করে জ্ঞানধর্মের উপদেশ করেন। এ কি করে সম্ভব হয় তার উত্তরে শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে 'অস্মিতা মাত্রে'র দ্বারা এই চিত্তগুলি নির্মিত হয়। নির্মাণচিত্ত ইচ্ছামাত্র রুদ্ধ করা যায় বলে তাতে অবিদ্যাসংস্কার জন্মায় না এবং তা বন্ধের কারণ হয় না। কল্পান্তে ঈশ্বর মুমুক্ষু ব্যক্তিদের এইভাবেই অনুগ্রহ করেন। এখানে আশঙ্কা হতে পারে যে যুগপৎ বহু চিত্ত কি করে একভাবে প্রযোজিত হয়? উত্তরে যোগশাস্ত্রে বলা হয় যে একই অন্তঃকরণ যেমন পঞ্চপ্রাণ ও নানা ইন্দ্রিয়ের প্রযোজক হয় তেমনই মূলীভূত এক উৎকর্ষযুক্ত চিত্ত নানা চিত্তের প্রযোজক হতে পারে। বিশেষত চিত্ত স্বরূপত বিভু হওয়ায় চিত্তের পক্ষে দৈশিক দূরত্ব বা ব্যবধান বলে কিছু নেই।

যোগ কি এবং কি নয়

পূর্বেই বলা হয়েছে যে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ করাই হ'ল যোগ। চিত্তবৃত্তির নিরোধ অর্থে একটি মাত্র জ্ঞানকে মনে রেখে অন্য সকলের নিরোধ (সম্প্রজ্ঞাত) অথবা সকল জ্ঞানের নিরোধ (অসম্প্রজ্ঞাত)। অভ্যাস অর্থে বারবার ক্রিয়াটি করা। কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বিনা চেষ্টায় অবশ বা স্বাধীনভাবে চিত্তের স্তব্ধভাব হয়—

যেমন নিদ্রায়, মূর্ছাবস্থায়, হিস্টিরিয়াগ্রস্ত অবস্থায় ইত্যাদি। কিন্তু ইচ্ছাধীন নয় বলে এগুলি যোগ নয়। নিরোধেরও তারতম্য আছে। চিত্তের প্রগাঢ় অন্তর্লীন একতানতা কখনও অল্প কখনও অধিক হতে পারে। সাধন করতে করতে কারো কারো স্বতঃই এক আনন্দের ও সর্বব্যাপিতার অনুভূতি হয়। কিন্তু অভ্যাস করে এই অবস্থার ধারণা ও ধ্যান না করলে অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী হয়ে এ অবস্থা লয় পায়। সমাধিসিদ্ধ হলে জ্ঞানের ও ইচ্ছাশক্তির চরম উৎকর্ষ হয়। কিন্তু সকল সমাধিসিদ্ধ যোগীই কি জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করবেন ? উত্তরে বলা যায় যে স্থূল উদ্দেশ্যে না হলেও লোকহিতার্থে, অবশ্যই করবেন।

যোগের ফল ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তি। যতক্ষণ পর্যন্ত বাহ্যাভিমান শরীরাভিমান ও ইন্দ্রিয়াভিমান থাকে ততক্ষণ আমরা দুঃখের দাস থাকি। পুত্র, বিত্ত, শরীর, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি অনাত্মকে আত্মজ্ঞান করে তাদের অপচয়ে বা হানিতে নিজে কষ্টভোগ করি। কিন্তু যোগী ইচ্ছাশক্তি বলে এই তিন অভিমান ভেদ করে বিবিক্ত হতে পারেন এবং এইভাবেই দুঃখজয় করেন।

চিত্তের সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস এই তিনের অন্যতম অবস্থা হতে পারে। রাজস চাঞ্চল্য কমলেই যে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হবে এমন নিশ্চয় নেই। সে সময় তামস ভাবও দেখা দিতে পারে। স্তব্ধতা অনেক ক্ষেত্রেই তামস অবস্থা। কেবলমাত্র বৃত্তিরোধ করলেই যে যোগসিদ্ধি হয় এমন নয়। স্বেচ্ছায় গ্রাহ্য (বিষয়), গ্রহণ (জ্ঞান) ও গ্রহীতা (জ্ঞাতা) র মধ্যে যে কোনও একটি তত্ত্বে স্থিতি করে যে বৃত্তিরোধ করা হয় তাই যোগ। অবশ স্তব্ধতা ও যোগের স্থৈর্য বাহ্যদৃষ্টিতে কতকটা একরকম হলেও স্বরূপত তারা অন্ধকার ও আলোকের মতই পরস্পরের বিপরীত।

যোগের মূল্যায়ন

যোগ মুখ্যত প্রয়োগশাস্ত্র। প্রয়োগবিধির বিচার শুধু তর্কের দ্বারা কখনও হতে পারে না। তবে সকল প্রয়োগবিদ্যারই মূলে কিছু তত্ত্বচিন্তা থাকে। যোগেরও আছে। যোগের মূল্যায়ন করবার সময় আমরা সেই তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তগুলিরই বিচার করবার চেষ্টা করব প্রয়োগের সম্ভাব্যতা বা যোগের প্রত্যক্ষফল 'বিভূতি' ইত্যাদি বিষয়ে মনন আমাদের মতে কিয়দংশে নিরর্থক হতে বাধ্য। কেননা শ্রদ্ধা ও বীর্য সহকারে যাঁরা যোগসাধন করছেন বা করেন

তাঁরা বিরুদ্ধযুক্তির দ্বারা নিবৃত্ত হবেন এমন আশা করা বৃথা। আর যাঁরা করেন না তাঁদের যুক্তি ক্ষুরধার হলেও যোগী সেগুলিকে অনভিজ্ঞের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দেবেন। অতএব আমরা যোগের তাত্ত্বিক প্রস্থানের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবো।

প্রথমেই যে সমস্যাটির সমাধান করতে হবে তা হ'ল যোগমতে মুক্তি কি এবং তা কার হয়? সহজ বুদ্ধিতেই বলে যে দুঃখ যার দুঃখমুক্তিও তারই হবে। সকলেই অনুভব কবেন 'আমার দুঃখ'। এখানে আশঙ্কা হয়। পাতঞ্জলমতে অহঙ্কার এবং বুদ্ধি তো জড়া প্রকৃতির বিকৃতি। এর 'মুক্তি কেমন করে হবে? যদি এই বিপদ এড়াবার জন্য বলা হয় যে 'মুক্তি প্রকৃতির হয় না পুরুষের হয় তখন আবার আশঙ্কা হয় যে পাতঞ্জলমতে পুরুষ বা শুদ্ধচৈতন্য তো নিত্যমুক্তস্বভাব। মুক্তের কি করে মুক্তি হবে? এই আশঙ্কার নিরাস করতে হ'লে স্মরণ করতে হবে যে পাতঞ্জলশাস্ত্রে 'অহং' শুধুই জড়রূপে কল্পিত হয়নি। 'আমি জ্ঞাতা' 'আমি দ্রষ্টা' এরকম বোধও তো আমাদের হয়। সুতরাং অহংকে চেতনার দ্বারা অধিষ্ঠিত জড় বলে স্বীকার করতে হবে। সুখ, দুঃখ এবং মোহ প্রকৃতির এই তিন গুণ আছে বটে কিন্তু সেই সুখ-দুঃখাদি জ্ঞাতার দৃষ্টির দ্বারাই প্রকাশিত হয়। চিত্তনিরোধ করলে এই জ্ঞেয় দুঃখ অব্যক্ত হয়ে যায় অর্থাৎ জ্ঞাতার দ্বারা প্রকাশিত হয় না। এই অবস্থাই মুক্তি। প্রকৃতপক্ষে একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে যোগশাস্ত্রে পুরুষের 'মুক্তি' না বলে 'কৈবল্য'ই বলা হয়েছে। যে যোগী এই কৈবল্য লাভ করেছেন তাঁর পক্ষে দৃশ্য রুদ্ধ হয়ে যায় এবং চিতিশক্তি বা দৃক্ শুদ্ধস্বরূপে অবস্থান করে।

কিন্তু, আবার প্রশ্ন করতে পারি যে 'মুক্ত পুরুষ' এমন ব্যবহারও তো দেখা যায়। এর দ্বারা কি পুরুষের দুঃখ হতে মুক্তি বা দুঃখহীনতা বোঝায় না? অতএব বলতে হবে যে পুরুষেরই দুঃখ এবং পুরুষেরই দুঃখ হতে মুক্তি। এই যে 'পুরুষের' বলে সম্বন্ধজ্ঞাপক শব্দ ব্যবহার, বাংলা ভাষায় এর একটি শিথিল এবং ব্যাপী প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—'নোড়ার (সংস্কৃত শিলাপুত্র) শরীর' কথাটি বলা হয় বটে তবে এটি তো একটি অলীক অর্থ। অঙ্গ, ধর্ম, বিষয় ও ক্রিয়া অর্থেও এই সম্বন্ধজ্ঞাপক 'এর' ব্যবহার পাই। যেমন 'রামের হাত' 'কাপড়ের শুভ্রতা' 'চোখের বিষয় রঙ' এবং 'পায়ের চলন' ইত্যাদি। আবার নির্বিকার সান্নিধ্যাদি অর্থেও এরূপ ব্যবহার হয়—যেমন দ্রষ্টার দৃশ্য। এই

শেষোক্ত অর্থে 'পুরুষের দুঃখ' 'পুরুষের মুক্তি' বলা যায়। পুরুষ জ্ঞাতা। তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তবেই দুঃখরূপ জ্ঞেয় জ্ঞাত হয়। পুরুষের থেকে বিযুক্ত হ'লে দুঃখ আর জ্ঞাত হয় না। এই জ্ঞাতাকে জ্ঞেয় দুঃখ হতে বিযুক্ত করবার চেষ্টাকেই কৈবল্যার্থ প্রবৃত্তি বলা হয়। এইজন্যই আমাদের অনুভব হয় 'আমি দুঃখী। আমি এরকম থাকব না। আমি দুঃখহীন, কেবল, নির্লিপ্ত, শুদ্ধ চৈতন্য হব।'

দ্বিতীয় সমস্যাটি হ'ল এই শুদ্ধ চৈতন্যের একত্ব বহুত্ব সংক্রান্ত। প্রশ্ন এই যে স্বরূপত জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা যখন দৃক্‌মাত্র বা চিন্মাত্র তখন তাকে বহু বলা যায় কি করে? শুদ্ধ চৈতন্যের বহুত্বনির্ণায়ক কোনও ভেদক ধর্ম তো নাই। তবু যদি এক জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা হতে অপর জ্ঞাতার ভেদ করি সে তো দৃশ্যের নানাত্বের কথা স্মরণ করেই করি। প্রত্যেকটি প্রতিসংবেত্তার সামনে ভিন্ন চিত্তবৃত্তি উপস্থাপিত হচ্ছে। এই হিসাবেই প্রতিসংবেত্তা বহু। এই আশঙ্কার উত্তরে যোগীরা বলে থাকেন যে যোগীর স্ববোধে যে প্রত্যক্‌চেতন বা পুরুষ ভাসিত হয় সে কখনই 'আমি আমিও আবার তুমিও' এইভাবে প্রকাশিত হয় না। বস্তুত স্ববোধে 'স্ব' ব্যতীত দ্বিতীয় কারুর পক্ষেই ভাসমান হওয়া সম্ভবই নয়। অতএব অদ্বৈতবাদী বেদান্তী আত্মার ঐক্যনামক যে সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় সেটি লব্ধ হয় না। তবে যোগের বহুপুরুষ বাদও তো এভাবে সিদ্ধ হয় না। কারণ একটু বিবেচনা করলেই দেখা যাবে যে স্ববোধে যেমন অন্য আত্মার সঙ্গে তাদাত্ম্যের অভিজ্ঞতা হয় না তেমনই আদৌ অন্য আত্মা বা পুরুষ যে আছে স্ববোধে তো সে নিশ্চয়ও হয় না। এ প্রসঙ্গে হয়তো যোগী তাঁর যোগলব্ধ অলৌকিক প্রত্যক্ষ ইত্যাদির কথা বলবেন। এই অলৌকিক ক্ষমতাবলেই তিনি পরচিত্তাভিজ্ঞও হতে পারেন। স্মরণ রাখতে হবে যে বহুপুরুষবাদ যোগশাস্ত্রের পক্ষে একটি অত্যাজ্য অবশ্যস্বীকার্য সিদ্ধান্ত। কেননা অপর পুরুষের, (যাঁরা বদ্ধ অথচ মুমুক্ষু) অস্তিত্ব স্বীকৃত না হ'লে যোগের উপদেশ ব্যর্থ প্রচেষ্টায় পর্যবসিত হয়। অথচ গীতায় তো স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই অর্জুনকে যোগের উপদেশ দিয়েছেন। এইসূত্রে যোগশাস্ত্রের সম্যক্‌ বিচারের অনুকূল একটি তথ্য মনে রাখা উচিত। যোগশাস্ত্রে সাধনপ্রণালীর উপর আলোকপাত করা হয়েছে। সাধক যাবৎ সিদ্ধ না হন তাবৎকাল তাঁকে একক অনন্য প্রবৃত্তি ও চেষ্টা করে যেতে হবে। সে অবস্থায় অন্য কারুর সঙ্গে তিনি অভিন্ন এ বোধ হওয়া সম্ভবও নয় সত্যও নয়। সিদ্ধি যখন লাভ

হয়ে যায় তখন অর্থাৎ কৈবল্যপ্রাপ্ত অবস্থায় পুরুষের পক্ষে একত্ব বহুত্বের প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।

পুরুষের বহুত্ব যেমন যোগব্যতীত অন্য সিদ্ধান্তে তর্কিত তেমনই প্রকৃতির একত্ব ও তাত্ত্বিকতাও ন্যায়বৈশেষিক, বেদান্ত ইত্যাদি সিদ্ধান্তে গ্রাহ্য হয়নি। ন্যায়বৈশেষিক সিদ্ধান্তে জগতের বহুবৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা হিসাবে বহুবিচিত্র মৌল উপাদান পরমাণুগুলি কল্পিত হয়েছে। সেখানে আরও বলা হয়েছে যে এই মৌল অবয়বগুলির ভিত্তিতে যে অবয়বীর উৎপত্তি হয় সেগুলি অবয়বগুলি হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন নূতন আরম্ভ। সাংখ্যপাতঞ্জলে এ মতগুলির কোনটিই গ্রহণ করা হয়নি। এ প্রসঙ্গে সাংখ্যের সৎকার্যবাদ ও তার সপক্ষে উপস্থাপিত যুক্তিগুলি স্মর্তব্য। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে একটি আশঙ্কার নিরসন কর্তব্য বলে মনে করি। আশঙ্কাটি হ'ল এই যে প্রকৃতির মধ্যেই যদি তাবৎ সংসার অব্যক্ত অবস্থায় থাকে তবে সকল সংসার এককালেই ব্যক্ত হয় না কেন? কেন আমরা প্রকৃতির একটি ক্রমিক অভিব্যক্তি দেখতে পাই? উত্তরে সাংখ্যপাতঞ্জল শাস্ত্রে নিমিত্তকারণের কথা বলা হয়। নিমিত্তকারণ যথা ধর্মাধর্ম মন্ত্র, ওষধি, রত্নাদি এগুলি প্রকৃতির প্রযোজক নয় কিন্তু তারা বাধার অপসারক। বাধাগুলি অপসৃত হ'লে প্রকৃতি স্বতই নিজ বিকৃতিতে পরিণত হয়। এখানে যোগভাষ্যকার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্যাপারটি পরিষ্কার করেছেন। কোনও কৃষকের দুখণ্ড জমির মধ্যের আলটি যখন সে কেটে দেয় তখনই কেবল একখণ্ড জমির থেকে জল গিয়ে অন্য খণ্ডটিকে প্লাবিত করতে পারে, নচেৎ অন্য জমিটি শুষ্কই থেকে যায়। আবার কৃষক যখন ক্ষেত্র থেকে আগাছা উপড়ে ফেলে তখন জমির রস ধান্যমূলে প্রবেশ ক'রে ধান্যশীর্ষকে পরিপুষ্ট করে তোলে। দুই স্থলেই কৃষক নিজে শুধু বাধা অপসারণ করেছে। তাতেই প্রকৃতির পরিণাম সম্ভব হয়েছে। সেইরকমই, একটি প্রস্তর খণ্ডকে যদি প্রকৃতি ধরি তবে তার মধ্যে বহুবিচিত্র আকার অব্যক্ত অবস্থায় আছে। ভাস্কর যন্ত্রের সাহায্যে বাধা অপসারিত করে দিলেই মূর্তি ব্যক্ত বা প্রকট হয়ে যায়। মানুষের করণশক্তিতেও বহু সম্ভাবনা থাকে। প্রকৃতির ক্রিয়ার নাম ধর্ম। যোগমতে লৌকিক শ্রুতি ছাড়াও আমাদের দিব্যশ্রুতি নামে একটি করণ আছে। তার ধর্ম দূরশ্রবণ। তার বিপরীত ধর্মের নাশ হলে তবে সেটি ব্যক্ত হয়। অতএব লৌকিক মানব শ্রুতির ক্রিয়া নিরুদ্ধ করলে তখন দিব্যশ্রবণ স্বয়ং প্রকাশিত হয়।

প্রকৃতির তাত্ত্বিকতা বিষয়ে সাংখ্যপাতঞ্জল সিদ্ধান্তের কঠোর বিরুদ্ধতা করেছেন অদ্বৈতবেদান্তীরা। শঙ্কর সিদ্ধান্তের মায়াবাদের মূল্যায়ন আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। তবুও যেহেতু প্রকৃতির তাত্ত্বিকতাকে অস্বীকার করতে হ'লে 'মায়া' 'আরোপ' 'অজ্ঞান' 'অধ্যাস' ইত্যাদির কথা বলতেই হয় সেই-জন্যই প্রাসঙ্গিক জ্ঞানে সে বিষয়ে সামান্য একটু আলোচনা করছি। প্রথমত, অদ্বৈত, নির্বিকার, নিষ্ক্রিয় আত্মা যে কিভাবে আরোপ বা রচনা করেন এবং 'রচ্য' ব্যতীত 'রচনা' যে কিভাবে কল্পনা করা যায় সে সমস্যার শঙ্কর দুইভাবে সমাধান করেন। প্রথমত তিনি মায়াকে সদসৎবিলক্ষণা অনির্বচনীয়া কিন্তু ভাবরূপা অবিদ্যা বলেছেন। তারপর, এই 'অনির্বচনীয়া মায়া' যে যুক্তিসিদ্ধ হতেই পারে না এবং অচিন্ত্যকে যুক্তির দ্বারা সাধন করার প্রচেষ্টা যে নিতান্তই বিরুদ্ধ প্রচেষ্টা সে দিকেও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অথচ শঙ্কর স্বয়ং এবং তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যেরা যুক্তিজাল বিস্তার করে এই বিরুদ্ধ প্রচেষ্টাই করে গিয়েছেন। শঙ্কর সাংখ্যের প্রকৃতিপরিণামবাদের সমালোচনা করে দুটি কথা বলেন। এক অচেতন প্রকৃতির পক্ষে রচনার জন্য প্রবৃত্তি থাকা কি করে সম্ভব হয়? আর দুই যদি পুরুষ উদাসীন হ'ন, অর্থাৎ প্রবর্তক বা নিবর্তক কিছুই না হন্ তবে প্রকৃতি কখনও সাম্যাবস্থায় থাকে আর কখনও মহদাদিক্রমে অভি-ব্যক্ত হ'তে থাকে এ কেমন করে হয়? শঙ্কর আরও বলেন যে অচৈতন্য প্রকৃতি ও উদাসীন পুরুষ এই দুইয়ের সম্বন্ধ ঘটাবার জন্য অতিরিক্ত কোনও সম্বন্ধয়িতার অভাবে প্রকৃতি পুরুষের সম্বন্ধই সিদ্ধ হয় না। আর যদি বলা হয় যে সম্বন্ধের প্রয়োজন নাই। পুরুষসন্নিধিমাত্রই প্রকৃতির প্রবৃত্তিকারণ, তবে তো প্রকৃতির নিবৃত্তি কখনওই হবে না। কেননা ঐ সন্নিধি তো নিত্য। সে ক্ষেত্রে মোক্ষই অসম্ভব হয়ে যাবে। সাংখ্যযোগের উত্তরগুলি এইরকম হবে। প্রকৃতি ইচ্ছাপূর্বক কিছু রচনা করতে পারে না সত্যি। তবে যা কিছু বিকার সবই তো রচ্য প্রকৃতিতেই লক্ষিত হয়। এইজন্যই সাংখ্যযোগে প্রকৃতিকে বিকারশীলা পরিণামী কর্ত্রী বলা হয়েছে। প্রকৃতির সাম্যাবস্থা ও অভিব্যক্তি বিষয়ে সাংখ্যপাতঞ্জল মত বুঝতে হ'লে সর্বদাই একটি কথা মনে রাখতে হবে যে তাঁদের সিদ্ধান্তে অভিব্যক্তির যে ক্রমিকতার কথা আছে তা কিন্তু কালিক ক্রমিকতা নয়। আগে মহান্ আত্মা ছিল পরে অন্তঃকরণাদি হ'ল এরকম মত সাংখ্য-যোগ কোনওদিনই স্থাপন করার চেষ্টা করেনি। আত্মভাবকে বিশ্লেষ করলে পরপর মহদাদি তত্ত্ব পাওয়া যায়—তাঁদের মত হল এই।

তাছাড়া পুরুষসান্নিধ্যে প্রকৃতির যে উপকার হয় তা সর্বদাই প্রবৃত্তিরূপ তাও নয়। বুভুক্ষুর ক্ষেত্রে তা প্রবৃত্তিরূপ কিন্তু মুমুক্ষুর পক্ষে তা নিবৃত্তিরূপ। অন্তঃকরণে সদাই বিদ্যা ও অবিদ্যা, প্রমাণ ও বিপর্যয় পরিণম্যমান অবস্থায় আছে। পুরুষপ্রকৃতির সংযোগ অবিদ্যা হতে হয়। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা এই অবিদ্যা নাশ করলে বিবেকখ্যাতি হয়। কিন্তু বিবেকখ্যাতি হলেই যে প্রকৃতি মায়ায় পর্যবসিত হবে সাংখ্যপাতঞ্জলশাস্ত্রে একথা স্বীকৃত হয়নি। এক অদ্বৈত চৈতন্য হ'তে কিভাবে জড়প্রপঞ্চের সৃষ্টি হ'তে পারে সে বিষয়ে 'মায়াবাদ' স্বীকার করার পক্ষে কোনও যুক্তি বেদান্তীরা দেখাতে পারেন না।

প্রকৃতিপুরুষের সম্বন্ধের বিধায়ক হিসাবে ক্লেশকর্ম বিপাকাশয় দ্বারা অপরামৃষ্ট পুরুষবিশেষের কল্পনা করে যোগ তাত্ত্বিক দিক থেকে লাভবান হয়েছে কি না সেটা ভেবে দেখার বিষয়। বস্তুত ঈশ্বর যদি বিশেষ পুরুষই হ'ন তবে সকল পুরুষের সম্বন্ধে যা বলা হয় তাঁর পক্ষেও তা প্রযোজ্য হবে। এবং সেক্ষেত্রে তিনি বিধায়ক এবং বিধেয় দুইই একই সঙ্গে হবেন। চিন্তার পক্ষে এ এক বড় রকমের অসঙ্গতি। আরও বিবেচ্য এই যে ঈশ্বরপ্রণিধান অর্থে যদি নিজ পুরুষে ঈশ্বরের শুদ্ধত্ব দর্শন বোঝায় তবে তাকে ঈশ্বরপ্রণিধান না বলে আত্মদর্শন বলাই বোধ হয় সঙ্গত। সর্বশেষে স্বীকার করতেই হবে যে যেহেতু যোগের স্বীকৃত পুরুষার্থ হচ্ছে আত্মার কৈবল্য সেইজন্য ঈশ্বরের স্থান বা প্রয়োজন যোগীর কাছে তেমন নয় যেমন ভাগবতমার্গের ভক্তিরসে সিঞ্চিত সাধকের কাছে। যোগমতে ঈশ্বর চিত্তের স্থৈর্য আনতে সহায়তা করেন সত্য তবে সে তো নিতান্তই বাইরে থেকে। ভক্তের সঙ্গে তার অন্তর্যামী ভগবানের যে রসমধুর নিবিড় সম্বন্ধ, যোগীর সঙ্গে ঈশ্বরের সে সম্বন্ধ হতে পারে না। অতএব নিষ্প্রয়োজন বাহুল্যজ্ঞানে যোগী ঈশ্বরচিন্তা বর্জন করেও সাধনমার্গে অগ্রসর হতে পারেন।

সর্বশেষে একটি প্রশ্ন তুলতে হচ্ছে। দুঃখ হ'তে মুক্তির উপায় চিন্তা করা মানুষের পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক। ভারতে দর্শন প্রাচীনকালে মোক্ষশাস্ত্র হিসাবেই গণ্য হত। যোগে এই দুঃখ হতে মুক্তির যে উপায় বলা হয়েছে সেটির সম্পর্কে বিরূপ সমালোচক অনায়াসেই বলতে পারেন যে এ যেন হাত ব্যথা করছে বলে হাত কেটে ফেলার মত। সংসার বা ব্যক্তাব্যক্ত প্রকৃতি জাত হলেই যখন দুঃখ তখন চিত্তবৃত্তি নিরোধ করে জ্ঞাতাকে বিবিক্ত চিন্মাত্রে প্রকাশিত করার চেষ্টা কর—যোগের এই নির্দেশ যদি সংসারের তাবৎ জীব

মেনে চলে তবে অবস্থা কেমন দাঁড়াবে সেটা প্রায় কল্পনাশক্তির অতীত। পুনশ্চ এরকমটা সম্ভব কি না তাও বিবেচ্য। প্রকৃতি হ'তে বিবিক্ত শুদ্ধ চৈতন্যের যখন সুখজ্ঞান নেই তখন সেই শুদ্ধ চৈতন্যরূপে অবস্থান করার প্রবৃত্তি সত্যই কয়জনের হয়? তীব্র বৈরাগ্য বা পর বৈরাগ্য স্বাভাবিক কি না এও বিবেচ্য। তবে তাত্ত্বিক বিচারই যখন আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য তখন কেবল গৌণভাবেই আমরা এ সমস্যার বিচারে প্রবৃত্ত হতে পারি। প্রয়োগবিদ্যার মূল্যায়নে প্রয়োজনের ও সম্ভাব্যতার বিচারও প্রাসঙ্গিকভাবেই আসে বলে এই দু'চারটি কথা বললাম।

দর্শনে শেষ সিদ্ধান্ত বলে কিছু নেই। সব সিদ্ধান্তে গ্রহণযোগ্য যেমন কিছু থাকে বর্জনযোগ্যও থাকে। যদি প্রথম হতেই অশ্রদ্ধার সঙ্গে সিদ্ধান্তের বর্জনীয় অঙ্গগুলির প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি হয়ে বিচার শুরু করি তবে ক্ষতি হবে আমাদেরই। এই কথা বলে পাতঞ্জল দর্শনের আলোচনা শেষ করলাম।

সংযোজনী

(ক) যোগবিষয়ক প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী—

(১) পতঞ্জলির যোগসূত্র।

(২) ব্যাসকৃত সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য

(৩) বাচস্পতিমিশ্রকৃত তত্ত্ববৈশারদী নাম্নী ভাষ্যটীকা।

(৪) বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত যোগবার্তিক নামক ভাষ্যটীকা।

(৫) ভোজরাজকৃত রাজমার্তণ্ডাখ্যবিবৃতি বা ভোজবৃত্তি।

(খ) যোগশাস্ত্রে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ—

১। অপরিগ্রহ
২। অপান
৩। অবিদ্যা
৪। অভাবপ্রত্যয়
৫। অভিনিবেশ
৬। অভ্যাস
৭। অষ্টযোগাঙ্গ
৮। অসম্প্রমোষ
৯। অস্মিতা
১০। আভ্যন্তরবৃত্তি
১১। আশয়
১২। আসন
১৩। ঈশ্বরপ্রণিধান
১৪। উপায়প্রত্যয়
১৫। উপেক্ষা
১৬। একাগ্র
১৭। কৈবল্য
১৮। ক্লেশ
১৯। ক্ষিপ্তভূমি
২০। চিতিশক্তি
২১। চিত্ত
২২। চিত্তবৃত্তি
২৩। তনুক্লেশ
২৪। তপঃ
২৫। ত্রিগুণ
২৬। দৃক্‌শক্তি
২৭। দৃশ্য
২৮। দ্রষ্টা
২৯। নিদ্রা
৩০। নিরুদ্ধভূমি
৩১। নিরোধ
৩২। নির্বীজ সমাধি
৩৩। পরবৈরাগ্য
৩৪। পরিণামদুঃখ
৩৫। প্রাণায়াম
৩৬। ব্রহ্মচর্য
৩৭। ভূমি (চিৎস্তর)
৩৮। ভোগ
৩৯। মোহ
৪০। যম
৪১। বাহ্যবৃত্তি
৪২। বিকল্প
৪৩। বিক্ষিপ্তভূমি
৪৪। বিচ্ছিন্নক্লেশ
৪৫। বিদেহলয়
৪৬। বিপর্যয়
৪৭। বিপাক
৪৮। বিবেকখ্যাতি
৪৯। শৌচ
৫০। শ্রদ্ধা
৫১। সংস্কারদুঃখ
৫২। সন্তোষ
৫৩। সমাধি
৫৪। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি

৫৫। স্বাধ্যায় ৫৬। হান ৫৭। হানোপায়
৫৮। হেয় ৫৯। হেয়হেতু ৬০। ধারণা
৬১। ধ্যান ৬২। নিয়ম ৬৩। প্রণব
৬৪। নিরতিশয় ৬৫। প্রতিসংবেত্তা ৬৬। প্রসংখ্যান
৬৭। সংযোগ

প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি

যোগসূত্র

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ। সমাধিপাদ।২॥

শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ। ঐ। ৯॥

অভাবপ্রত্যয়ালম্বনাবৃত্তির্নিদ্রা। ঐ। ১০॥

অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ। ঐ। ১২॥

ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ। ঐ। ২৪॥

তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞবীজম্। ঐ। ২৫॥

পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ। ঐ। ২৬॥

অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা। সাধনপাদ। ৫॥

দৃগ্দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতেবাঽস্মিতা। ঐ। ৬॥

হেয়ং দুঃখমনাগতম্। ঐ। ১৬॥

দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ। ঐ। ১৭॥

তস্য হেতুরবিদ্যা। ঐ। ২৪॥

তদভাবাৎ সংযোগাভাবো হানং তদ্দৃশেঃ কৈবল্যম্। ঐ। ২৫॥

বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ। ঐ। ২৬॥

তদ্বৈরাগ্যাদপি দোষবীজক্ষয়ে কৈবল্যম্। বিভূতিপাদ। ৫০॥

জন্মৌষধিমন্ত্রতপঃসমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ। কৈবল্যপাদ। ১॥

পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি। ঐ। ৩৪॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥ ২।৪৫
যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥ ২।৪৮
ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ॥ ৪।১
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ॥ ৪।২
স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্॥ ৪।৩
যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥ ৬।১০
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজীনকুশোত্তরম্॥ ৬।১১
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥ ৬।১২
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্॥ ৬।১৩
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥ ৬।১৪
যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ॥ ৬।১৯
অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥ ৬।৩৫
তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপিমতোঽধিকঃ।
কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন॥ ৬।৪৬